দাম ঃ চার টাকা

স্বস্তিকা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্ম সার্ধশতবর্ষ

স্মরণ সংখ্যা।। ২ আগষ্ট, ২০১০

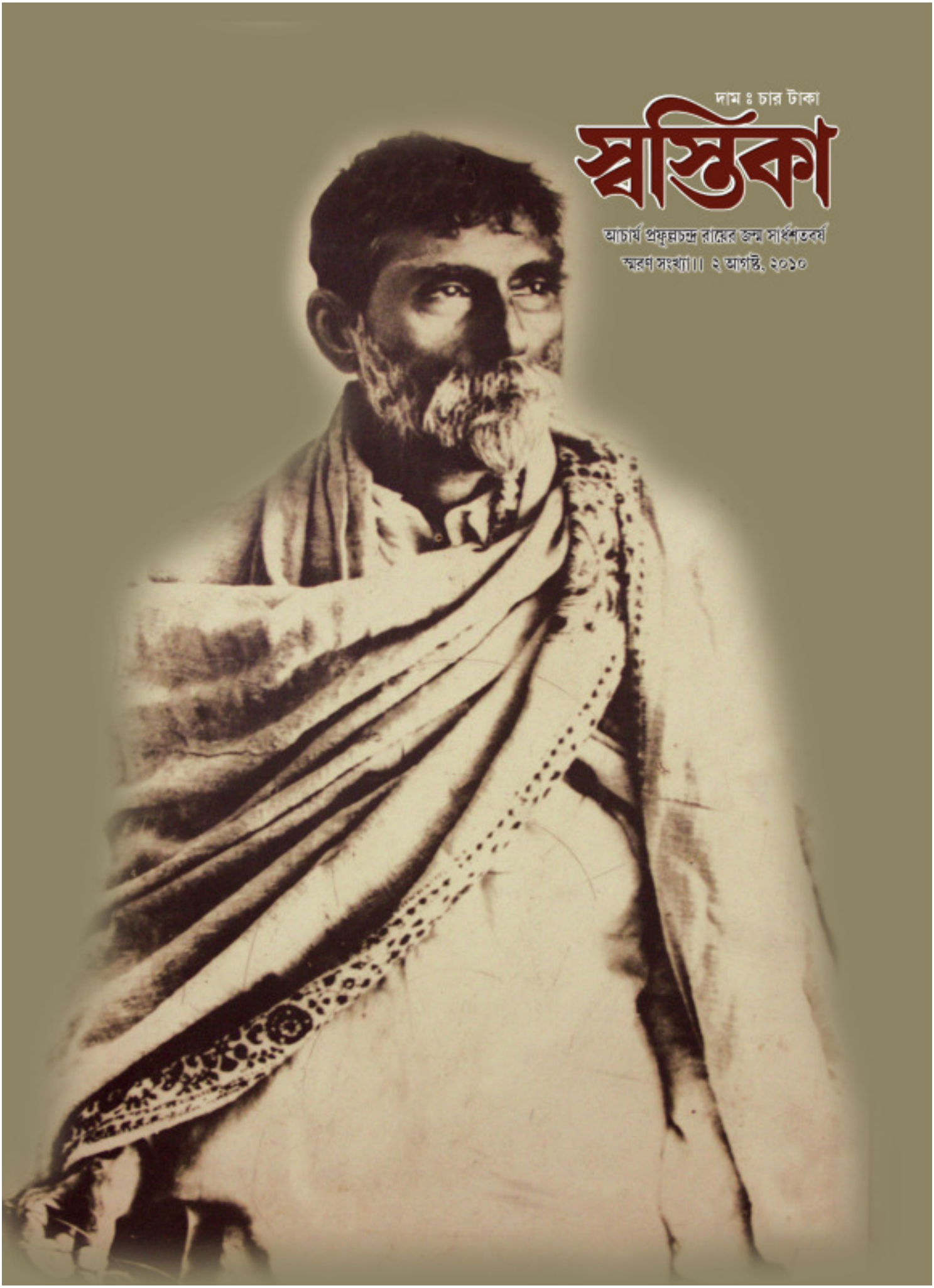

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ❖ ৭

সার্ধশততম জন্মজয়ন্তীর আলোয় আচার্য রায় ❖
অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায় ● ৯

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সমাজ নির্মাণের সাধনা ❖
ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায় ● ১৫

সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ❖
অজিত কুমার বিশ্বাস ● ২১

বেঙ্গল কেমিক্যালের এম ডি সুপ্রকাশ কুণ্ডু র একান্ত সাক্ষাৎকার ❖
অর্ণব নাগ ● ২৫

পরাধীন ভারতে নব্য-রসায়ন শিল্পের পথিকৃৎ ❖
ডঃ নিতাইচন্দ্র মণ্ড ল ● ২৯

দুই মহারথীর পত্র ❖ ৩৩

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ ঃ অজিত ভকত

।। দাম ৪ টাকা।।

Registration No.-Kol.RMS/048/2010-2012

LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT

L. No.-MM & P.O. / SSRM-KOL.RMS/RNP-048/
LPWP-028/2010-12 ● R N I No. 5257/57

দূরভাষ ঃ ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫, টেলিফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা - ৬ হতে মুদ্রিত।

সম্পাদক।। বিজয় আঢ্য

স্বস্তিকা

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের
জন্মসার্ধশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা
৬২ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
যুগাব্দ - ৫১১২
২ আগষ্ট , ২০১০

সম্পাদকীয়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে কয়েকজন মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষেত্রে আজও বিশেষভাবে ভাস্বর হইয়া আছেন। এমনই এক মনীষী বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তাঁহার 'আত্মচরিত' গ্রন্থে ভারতীয় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের তিনি পথ দেখাইয়াছেন—কিভাবে ভারতীয় বিজ্ঞানের অগ্রগতি করা যায়। নাইট্রাইট যৌগের মাস্টার, স্কুল অফ কেমিস্ট্রীর সৃজনকারী প্রফুল্লচন্দ্র আবার শুধু বিজ্ঞান লইয়াই আলোচনা করেন নাই;শিক্ষা, শিল্প-বাণিজ্য, অর্থনীতি, ইতিহাস ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিষয়েও দিক্‌নির্দেশ দিয়াছেন। চিন্তা-ভাবনায় তিনি ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক। আবার তিনি বাঙালীর আপনজন, এক ব্যতিক্রমী আপনজন। বাঙালীর আর্থিক দুর্দশা, বাঙালীর দৈন্য, বাঙালী-চরিত্রের দুর্বলতা লইয়া এমন আর কোনও মনস্বী দিবারাত্র চিন্তা করিয়াছেন, তাহার উদাহরণ নাই। তিনিই একমাত্র বিজ্ঞানী যিনি গবেষণাগারের গজদন্তী মিনারে না বসিয়া থাকিয়া সাধারণ মানুষের পাশে আসিয়া সক্রিয় কর্মদ্যোগ গ্রহণ করিয়া দৃষ্টান্ত স্থাপন করিয়াছেন। ভাবিলে বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়, ক্ষীণতনু এই ঋষিপ্রতিম মানুষটির কী বিপুল পরিমাণ সম্মোহনী শক্তি ছিল যাহার ফলে তাঁহার জীবন এক মহাযজ্ঞ সমাধা করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন ভারতের ঋষির ন্যায় তাঁহার জীবনচর্চা ও চর্যা। দেশবাসী তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাকে 'আচার্য' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিল। প্রকৃত অর্থেই তিনি আচার্য।

মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে স্বাধীন করিবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন বৈভবের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও তাঁহার স্বপ্ন ছিল। দেশ আজ স্বাধীন হইয়াছে, সমৃদ্ধ ও হইয়াছে। বিশ্বে আর্থিক সম্পদে বলীয়ান জি-৮ দেশগুলির গোষ্ঠী সম্মেলনে আজ আমাদের দেশও আমন্ত্রিত—মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু যে দরিদ্র নারায়ণের দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি সতত সচেষ্ট ছিলেন, আজও তাহা পূরণ হয় নাই। দেশের প্রায় ৩৬ শতাংশ মানুষ এখনও দারিদ্র্য সীমার নীচে। দেশে মোবাইল ফোনের সংখ্যার তুলনায় শৌচাগারের সংখ্যা কম। আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থাকে কেহ কেহ 'রিচ নেশন উইথ পুত্তর পপুলেশন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

যে মাতৃভাষায় অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, তাহা এখন 'দূরঅস্ত'। ভারতীয় ভাষাগুলি বর্তমানে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইতে ব্যস্ত। এই দেশের একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী তথা সংবাদমাধ্যম হিন্দী নয়, ইংরাজীকেই যোগাযোগ রক্ষাকারী ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করিতে সক্রিয় হইয়াছে। যদিও বিশ্বের প্রতিষ্ঠিত দেশগুলি, যেমন, রাশিয়া, চীন, জাপান, জার্মানী, ফ্রান্স, এমনকী ইতালি এবং বাংলাদেশও আপন আপন ভাষাকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জিত হইয়াছে, কিন্তু যে স্বাভিমান ও স্বাজাত্যবোধের জন্য আচার্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই।

ফরিদপুর হিন্দু মহাসভার সভাপতির অভিভাষণে (১৯২৫) তিনি যে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি যথোচিত গুরুত্ব আরোপ না করিবার পরিণাম—দেশবিভাগ, হিন্দুদের লাঞ্ছনা ও দেশত্যাগ। সেদিন তিনি বলিয়াছিলেন—"এখনও যদি আমাদের মোহ নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০/২৫০ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ট হইতে বিলুপ্ত হইবে।" তাঁহার এই সতর্কবাণী আজও যে কত প্রাসঙ্গিক বর্তমান ভারতের দিকে তাকাইলে তাহা সম্যক উপলব্ধি হইবে। ভারতের জনভারসাম্যর যে হারে বিচ্যুতি ঘটিতেছে তাহাতে আচার্যের সতর্কবাণীকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। যে বৈষম্যমূলক জাতিভেদ প্রথার তিনি নিবারণ চাহিয়াছিলেন, আজকের রাজনৈতিক ব্যবসায়ীরা জাতপাতের ভিত্তিতে জনগণনার দাবী করিয়া সেই বৈষম্যকেই দৃঢ় করিতে ব্যস্ত। ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্যের আর কী হইতে পারে? স্বদেশের পরাধীনতার কারণ হিসাবে তিনি যে 'অস্পৃশ্যতার অভিশাপ'-এর কথা বলিতেন, এখনও আমাদের সমাজ সেই অভিশাপ হইতে পুরোপুরি মুক্ত হয় নাই।

কৃশতনু চিরকুমার ছাত্রবৎসল আচার্যের অনাড়ম্বর জীবনযাপন যে ব্রত সাধনে সমর্পিত হইয়াছিল, তাহা এখনও পূরণ হয় নাই। 'আত্মচরিত' গ্রন্থে তাঁহার আশা—"আমার মানসনেত্রে আমি একটি মহৎ জাতির নব অভ্যুদয় দেখিতেছি,—বীর্যশালী কেশরীর মতোই নিদ্রা হইতে জাগিয়া উঠিয়া সে তাহার কেশর সঞ্চালন করিতেছে।' আচার্যের সার্ধশত জন্মবর্ষে তাঁহার এই আশা বাস্তবে রূপায়িত করিতে কতটা সক্ষম হইব—ইহাই আমাদের সামনে চ্যালেঞ্জ। কেননা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের ইহাই একমাত্র পথ।

সার্ধশততম জন্মজয়ন্তীর আলোয়

আচার্য রায়

অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ রায়

আচার্য রায় বলতে এখনো অবধি বোঝায় শুধুই প্রফুল্ল চন্দ্র রায়কে যিনি বাঙালী তথা ভারতবাসীকে চিনিয়ে ছিলেন স্বনির্ভরতা অর্জনের পথ, দেখিয়ে ছিলেন প্রকৃত শিক্ষক বলতে কী বোঝায়, বিশ্ববাসীকে বিজ্ঞাপিত করেছিলেন হিন্দুদের বিজ্ঞানচর্চার ঐতিহ্যের কথা। বাংলাদেশের কপোতাক্ষ নদের প্রবাহ উপহার দিয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তকে যিনি বাংলা ভাষায় নতুন প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। আর দিয়েছিল প্রফুল্ল রায়কে যিনি ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার সুমহান ইতিহাসকে নতুন খাতে প্রবাহিত করেছিলেন, ভাস্বর ক'রে তুলেছিলেন। সমসাময়িক কালকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে রামমোহন-বিদ্যাসাগর সূচিত নবজাগরণের অনতিকালের মধ্যেই উদ্ভব ঘটিয়েছিল এক ঝাঁক জ্যোতিষ্কের, সাহিত্য ও বিজ্ঞানসহ জীবনচর্যার নানা ক্ষেত্রে গভীর স্বদেশানুরাগেই এইসব জ্যোতিষ্ক মনীষীদের চালিকাশক্তি ছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে উত্থানের—রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে, জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র বিজ্ঞানে, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

জাতির উপর বৃটিশ শাসন আরোপিত হীনমন্যতাবোধ ভুলিয়ে দিয়েছিল যে আমাদের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস সুপ্রাচীন, ভুলিয়ে দিয়েছিল পঞ্চ দশ শতাব্দীর আগে অবধি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আমরাই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ ছিলাম, ভুলিয়ে দিয়েছিল বিশ্বমানবতাবোধ আমাদের ভারতীয় দর্শনেরই অবদান, নবজাগরণের প্রভাবে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উজ্জ্বল-আবির্ভাবের মধ্যে লক্ষণীয় এই যে প্রফুল্লচন্দ্রই শুধু নিজের প্রতিভার বিকাশ ঘটাননি, অন্যান্য প্রতিভাধরদের প্রতিভা বিকাশের জন্য অক্লান্ত সাধনায় ব্রতী ছিলেন। অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেশের দুর্দশার কারণ তুলে ধরে জাতির অর্থনৈতিক বিকাশের প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন অত্যন্ত ইতিবাচক ভাবে, ব্যক্তিগত উদ্যোগে এবং তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে। সমগ্র জাতি নিয়ে তাঁর ভাবনার প্রকাশ দেখা যায় তাঁর ছাত্রাবস্থায় যখন এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনার ব্যস্ত ছিলেন। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর 'India : Before and after Mutiny' (সিপাহী বিদ্রোহ) শীর্ষক এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেন। বৃটিশ সরকারেরই 'গিলক্রাইস্ট' বৃত্তি নিয়ে রসায়ন পড়তে যাওয়া ছাত্র প্রফুল্লচন্দ্র অকুতোভয়ে বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক দূরবস্থা নিয়ে মনের সমস্ত ক্ষোভ প্রকাশ করে ওই প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেন। By An Indian Student বলে লিখিত ওই প্রবন্ধটি সর্বোত্তম হওয়া সত্ত্বেও প্রথম করেনি বিচারকমণ্ডলী বৃটিশ সরকারের

বিরূপতার কারণে। কিন্তু উন্নতমনা বৃটিশ নাগরিক তথা সংসদ সদস্য অনেকেরই অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করে প্রবন্ধটি (চিত্র)। E & S Livingston Publisher এডিনবার্গ থেকে প্রবন্ধটি ক্ষুদ্র পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিল ১৮৮৬ সালে। বস্তুনিষ্ঠভাবে বিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রটি তিনি নিপুণভাবে তুলে ধরে গ্রেট বৃটেন ও আয়ারল্যান্ডের তরুণ প্রজন্মের কাছে আবেদনও রেখেছিলেন—সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণের জন্য ঃ "The lamentable condition of India at present is due to England's Culpable neglect of and gross apathy to the affairs of that Empire-England has hitherto failed grievously failed–in the discharge of her sacred duties to India. It is you, the rising generation of Great Briten and Ireland, that we look for the inagration of a more just, generous and humare Policy to India a policy which will not seck a justification in such platitude as inevitable course "non possumos" eternal fitnem of things but are whose sole issue will be a closer union between India and England. In you are centred all our hopes."

১৮৮৭ সালে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে মৌলিক পদার্থ সমূহের পর্যায়বৃত্ত শ্রেণী বিভাগের উপর গবেষণা করে প্রফুল্লচন্দ্র ডি.এস সি পেলেন। তাঁর প্রদত্ত থিসিসের বিচারক ছিলেন আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউন, জন গিবসন ও লেনার্ড ডবিন। থিসিসটি ১৮৮৭ সালের সর্বশ্রেষ্ঠ থিসিস বিবেচিত হয় এবং ডি এস সি উপাধি ছাড়াও প্রফুল্লচন্দ্র হোপ পুরস্কার এবং আরও দুটি স্কলারশিপ পান। দেশে ফিরে ১৮৮৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজে রসায়ন বিভাগে স্যর আলেকজান্ডার পেডলারের সহযোগী হিসেবে যোগ দেন। পেডলারই প্রথম হুগলী নদীর জল বিশ্লেষণ ও তার ফলাফল এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে প্রকাশ করে গবেষণার সূত্রপাত করেন। প্রফুল্লচন্দ্র যোগ দেবার পর ভারতীয় খাদ্যবস্তুর তথা ঘি, সরিষার তেল ইত্যাদির রাসায়নিক বিশ্লেষণ করেন ভেজাল নিবারণের জন্য এবং তা ১৮৯৮ সালে দুটি প্রবন্ধের আকারে Asiatic Society পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে তিনি আবিষ্কার করেন এ তাবৎ অভাবিত এক যৌগ মারকিউরিয়াস নাইট্রাইট। এই আবিষ্কার জার্মানির ''Zeiffschriff for Anorganische Chemic" -এ প্রকাশিত হতেই তিনি বিশ্বখ্যাত হয়ে পড়েন। নাইট্রাইটের উপর তাঁর বিস্তৃত কাজের জন্য বিশ্বের শীর্ষ বিজ্ঞানীরা তাঁকে 'Master of Nitrites' আখ্যায় ভূষিত করেন। ১৮৯৭ সালে Proceedings of the Chemical Socicty-তে প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধ 'Conjugated Sulpualis and isomorphus mixture of the Copper-Molybdinum group' বিশ্বে আলোড়ন তুলে দেয়। যুগ্ম লবণের উপর তাঁর কাজ আজ সার্ধশত বৎসর কালেও সমান প্রাসঙ্গিক, পারদের উপর কাজে তাঁর ভীষণ প্রবণতা ছিল। সম্ভবত প্রাচীন ভারতে এক বিশেষ ব্যবহারের জন্য। এই স্বল্প পরিসরে তাঁর কাজের বিবরণ অসম্ভব। তাই যে সমস্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জার্নাল তাঁর প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করেছিল তার কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যায়।

(১) J.C.S.–Journal of the Chemical Society of London (U.K.)

(২) P.C.S.–Proceeding of the Chemical Society (U.K.)

(৩) Z.A.C.–Zeitschriff fur Anorgonische Chemic (Germany)

(৪) Nat–Nature (U.K.)

(৫) A.C.P.–Annuales de Chim Physiqm (France)

(৬) J.A.S.–Journal of the Asiatic Society (India)

(৭) J.I.C.S.–Journal of the Indian Chemical Society প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি প্রফুল্লচন্দ্র (১৯২৪)।

এর পাশাপাশি সুযোগ্য ছাত্র তৈরিও চলছিল তাঁর নেতৃত্বে। প্রফুল্লচন্দ্র যে দুটি বিষয়ে অত্যন্ত সজাগ ও সক্রিয় হয়েছিলেন তা হলো—(১) এডিনবার্গ-এ পড়াশোনার সময় একটা দেশের অর্থনীতিতে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির অসামান্য ভূমিকা লক্ষ্য করে ভারতেও অনুরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখা।

(২) তের বছর বয়স থেকে 'বঙ্গদর্শনে' মাঝেমধ্যে প্রকাশিত চরক সুশ্রুত নাগার্জুন প্রমুখদের কথা জেনে এদের সম্বন্ধে তথা ভারতীয় রসায়নচর্চা সম্বন্ধে বিশদ জানার ও জানানোর দায় অনুভব করা।

এই আগ্রহগুলিই জন্ম দিয়েছিল (১) ১৮৯০ সালে Bengal Chemical and Pharmacutical Works নামক প্রতিষ্ঠানের এবং (২) History of Hindu Chemistry নামক এক চাঞ্চ ল্যকর গ্রন্থের যা পাশ্চাত্য পন্ডিতবর্গের ভারতীয় জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা নিয়ে যে অজ্ঞতা ছিল তা দূর করে দিল এবং প্রকৃত তথ্য জানাল বিশ্ববাসীকে। তাঁর জন্মের সার্ধশতবৎসরে দেশের বর্তমান আর্থসামাজিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবেচনায় ওই দুটি বিষয়কে তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের লক্ষ্য।

১৮৯০ সালে ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডে একটি ছোট ঘর যার সামনে পিছনে কিছুটা খোলা জমি,—এখানেই সালফিউরিক অ্যাসিড, সাইট্রিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরাস ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য পরীক্ষা। নিরীক্ষা শুরু করলেন। নিজস্ব মাসিক মাত্র ২৫০ টাকা মাহিনাকে সম্বল করে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়াস স্বদেশ-ভাবনা-তাড়িত প্রফুল্লচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব ছিল। এক অনিশ্চি ত ভবিষ্যতের বাতাবরণের মাঝেই একদিন তাঁরই মতো স্বপ্ন দেখা স্বদেশানুরাগী এবং অধ্যবসায়ী এক বন্ধু ডঃ অমূল্যচরণ বসু এসে যোগ দিলেন তাঁর সঙ্গে। সম্মিলিত উদ্যোগে তৈরি হতে থাকল। সোডিয়াম ফসফেট, সুপার ফসফেট অফ লাইম (সার) এবং গবাদি পশুদের হাড় থেকে ক্যালসিয়াম ফসফেট। আয়ুর্বেদীয় ওষুধ তৈরিতে আগ্রহী প্রফুল্লচন্দ্র কবিরাজদের সাহায্যে অ্যাটকিনস সিরাপ, কালমেঘ, কুর্চির সার, বাসক সিরাপ ও জোয়ানের আরক তৈরি করতে থাকলেন এবং এগুলির বাজারও পেলেন—চাহিদা বাড়তে লাগল—এখনও এসবের চাহিদা আছে।

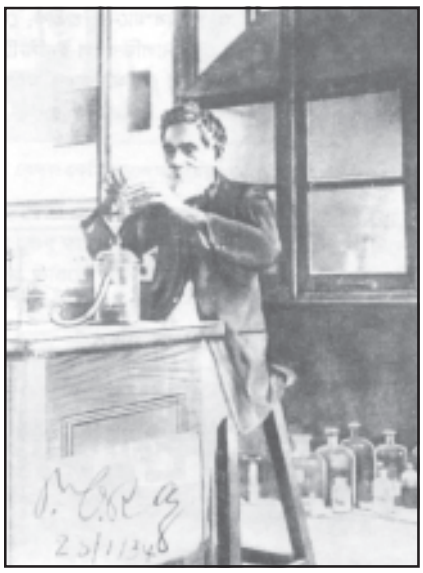

BCPW ল্যাবে আচার্য

ডঃ উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (কালাজ্বরের ওষুধের আবিষ্কারক), স্যার নীলরতন সরকার ও ডাঃ সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারী রোগীদের জন্য এসব ওষুধের অনুমোদন দিতে থাকলেন এবং হাসপাতালেও এগুলি ব্যবহৃত হোত। বাজারে ওষুধগুলির চাহিদা বাড়ার সাথে সাথে বেঙ্গল কেমিক্যাল-এর আয়তন বাড়তে থাকল। বাংলার বাইরেও শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত হলো, কানপুর ও বোম্বাইতেও কারখানা খোলা হলো, পানিহাটিতে নতুন কারখানা খোলা হলো—এখানে সালফিউরিক অ্যাসিড ছাড়া ফিনাইল, ন্যাপথলিন বল ও নানা ধরনের সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত হতে থাকল। ১৯০১ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালকে লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত করা হলো—নাম হলো The Bengal Chemical and Pharmacutical Company Limited—এডিনবার্গে জন্ম নেওয়া স্বপ্ন বাস্তবায়িত হলো, তাঁর পথ অনুসরণ করে তার সহযোগিতা ও উপদেশ অবলম্বন করে অন্য শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠতে থাকল, ১৯১৯ সালে মৃৎশিল্প Bengal Potteries Ltd., ১৯২১ সালে Bengal Enamel Works Ltd. প্রত্যেকটির পিছনে ছিল প্রফুল্লচন্দ্রের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সংযুক্ত, অনুপ্রেরিত তাঁর শিষ্যেরা পরে Calcutta Chemical তৈরি করেছিলেন যা সুবিখ্যাত হয়েছিল। ডঃ বর্মন অনুপ্রাণিত হলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সংস্পর্শে এসে। তাঁর মনে ঘুরতে থাকল এত গাছ-গাছড়া লতা এবং রসায়নচর্চার গরিমাময় উত্তরাধিকার থাকতে এদেশের লোক রোগে দেশীয় ওষুধ পাবে না কেন? প্রতিষ্ঠা হলো ডাবর কোম্পানির। সেই ডাবর কোম্পানি আজ আন্তর্জাতিক বাজারে অংশ গ্রহণ করছে। এসবই প্রফুল্লচন্দ্রের অনুপ্রেরণা সঞ্জাত। কিন্তু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের সবচাইতে তাৎপর্যমণ্ডিত অবদান হলো প্রাচীন ভারতে রসায়ন চর্চার তথ্য সম্বলিত দুই খণ্ডের বৃহদাকার গ্রন্থ 'A History of Hindu Chemistry'—প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৯০৪ সালে এবং ১৯০৯ সালে। প্রায় ১২ বছর ধরে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে থাকা পুঁথিপত্র তন্ন তন্ন করে সংগ্রহ করেছেন, সাধ্যমতো খোঁজ করেছেন নেপালে থাকা পুঁথির এবং লন্ডনের ইণ্ডিয়া অফিস গ্রন্থাগারের সংগৃহীত পুঁথিরও। বিজ্ঞানের ইতিহাস রচনায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা মিশর, চীন, আরব এর অবদান নিয়ে আলোচনা করেছেন অথচ আরব ভারত থেকেই জ্ঞানবিজ্ঞান আহরণ করেছিল। ভারতের ভূমিকাকে একেবারে অন্ধকারে রেখেছিল পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা, পীড়াদায়ক এই ব্যাপারটিই প্রফুল্লচন্দ্রকে প্রকৃত সত্যকে তুলে ধরতে প্ররোচিত করেছিল। তাঁর গ্রন্থে তথ্য ও প্রমাণ সহযোগে ভারতীয় রসায়নচর্চার নিদর্শন এবং কী ভাবে তা আরব মারফৎ পাশ্চাত্য দেশে পৌঁছেছিল প্রফুল্লচন্দ্র তুলে ধরেন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী বার্থেলা (Bertheloll) চমৎকৃত ও নিশ্চি ত হয়ে 'Journales-Savarts (Jan 1903)-তে A History of Hindu Chemistry সম্পর্কে ১৫ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। হিন্দু রসায়নবিদগণের রসায়নচর্চার দর্শনও সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়। তখন অনুপাতবিধি ঠিক জানা ছিল না, তবুও পরীক্ষা-নিরীক্ষা ক'রে বিভিন্ন প্রকার যৌগ তৈরি করা হোত মৌল পদার্থ নিয়ে। রসেন্দ্রচিন্তামণি গ্রন্থের রচয়িতা ঢুন্ডুকনাথ প্রথম অধ্যায়েই বলেছেন ঃ

"অশ্রৌষং বহুবিদূষাং মুখাদপশ্যাং শাস্ত্রেষু
স্থিতমকৃতং ন তল্লিখামি
যৎকর্ম ব্যরচয়মগ্রতো গুরুনাং প্রৌঢ়ানাং
তদিহ বদামি বীতশঙ্কঃ"।

অর্থাৎ, যাহা বহু পন্ডিতের মুখে জানিয়াছি এবং শাস্ত্রে দেখিয়াছি কিন্তু কার্য দ্বারা সম্পন্ন করি নাই, তাহা না শিখিয়া, বৃদ্ধ বৈদ্যের সম্মুখে শুনিয়া যে গুলি কার্য দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছি, আমি নিঃসঙ্কচিত্তে সেগুলিই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি"। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে ভারতে

রসায়ন চর্চার ইতিহাসকে চারটি স্তরে ভাগ করেছেন, (১) বৈদিক আয়ুর্বেদিয় পর্যায় (বৈদিক যুগ থেকে অনুমানিক ৮০০ খৃস্টাব্দ অবধি) (২) ক্রান্তিকাল (৮০০ খৃঃ থেকে ১১০০ খৃস্টাব্দ অবধি) (৩) তান্ত্রিক পর্যায় (১১০০ খৃঃ থেকে ১৩০০ খৃস্টাব্দ অবধি) এবং (৪) ঔষধবিজ্ঞানের যুগ (১৩০০ খৃঃ থেকে আনুমানিক ১৫০০ খস্টাব্দ অবধি)। রসায়নচর্চা মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল (১) বিভিন্ন গাছ, লতা, গুল্ম থেকে মানুষকে সুস্থ রাখার তথা অমরত্ব (?) অর্জনের জন্য বিভিন্ন ধরণের ওষুধ প্রস্তুত করা (২) বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন করে তা থেকে যৌগ তৈরি করে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা, ফলতঃ রসায়নচর্চার মাধ্যমে চিকিৎসাবিদ্যা ও ধাতুবিদ্যা হাত ধরাধরি করে উন্নতির পথে চালিত হয়েছিল। 'রসায়ন' শব্দটিও ওই সময়েই উদ্ভূত হয়েছিল বলে তাঁর ধারণা। চরকের মতে যাহা মানুষকে দীর্ঘজীবী করে, স্মৃতিশক্তি বর্ধন করে, স্বাস্থ্য শক্তি ও পুরুষত্ব দান করে আয়ুর্বেদমতে তাহাকেই 'রসায়ন' বলে। 'রস' বলতে চরক ও সুশ্রুতের মতে 'ঘন ক্বাথ'। পরবর্তীকালে যখন ধাতুঘটিত ও পারদঘটিত ওষুধের প্রচলন হয় তখন শরীরস্থ রসের উপর পারদের আশ্চর্য প্রভাব লক্ষ্য করে পারদকেই রস বলা শুরু হয়েছিল—তার প্রয়োগ পদ্ধতিই হলো 'রসায়ন', পরে অন্যান্য ধাতু থেকেও ওষুধাদি তৈরি হয় এবং ওই 'রসায়ন' শব্দার্থ বিবর্তিত হয়ে ইংরাজী 'Chemistry'র সমার্থক হয়ে উঠল। চিকিৎসাবিজ্ঞানের পরিপূরক হিসেবে রসায়ন চর্চিত হতে থাকল। পরে তাকে ব্যাপকায়িত করতে ধর্মাচরণের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে তন্ত্রসাধনার অঙ্গীভূত করা হয়। বৌদ্ধ ধর্মেও এই ভাবে বুদ্ধ তথাগত বা অবলোকিতেশ্বরের অবতারণা করা হয়েছে। হিন্দু শাস্ত্রে এই সব জ্ঞানের উৎস হিসেবে ভৈরব ও পার্বতীকে মনে করা হয়েছে। কয়েকশত বৎসরের ব্যবধানে লিখিত চরক সংহিতা ও সুশ্রুত সংহিতা চিকিৎসা ও রসায়নের উৎস গ্রন্থ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। প্রফুল্লচন্দ্রের ধারণায় নানা স্থান থেকে চিকিৎসকরা এসে হিমালয়ের পাদদেশের কোথাও মিলিত হয়ে নানা আলোচনান্তে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিই চরক সংহিতাতে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। ওই সংহিতাতে দাদ, কাউর, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ নিরাময়ের জন্য তুঁতে, হীরাকষ হরিতাল (আর্সেনিক সালফাইড) ও গন্ধক সহযোগে ওষুধ তৈরির প্রণালী বর্ণিত আছে। সোনা, রূপো, লোহা থেকেও বলবর্ধক ঔষধ তৈরির বিবরণও লিপিবদ্ধ আছে। অর্থাৎ চরকের সময়ের আগেই ওই সব ধাতুর নিষ্কাশন প্রণালী ও যৌগ তৈরীর প্রণালী হিন্দুদের জানা ছিল। প্রফুল্লচন্দ্র দেখিয়েছেন যে চরকই আয়ুর্বেদের জনক অনেকে মনে করলেও অগ্নিবেশ, ভেল, জাতুকর্ণ, পরাশর, হারীত এবং ক্ষারপানী প্রমুখদের লিখিত আয়ুর্বেদ গ্রন্থও ছিল।

সুশ্রুত সংহিতাতে চরকসংহিতার মতো চিকিৎসাপদ্ধতি নিয়ে এর চিকিৎসার উপরেই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ক্ষার (Alkali) প্রস্তুতি ও প্রয়োগ নিয়ে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে সুশ্রুতে। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন "ক্ষার ধর্মের এই বিবরণ এত সুন্দর ও বিজ্ঞানসম্মত যে আধুনিক ক্ষারধর্ম পদ্ধতির সহিত ইহার কোনও প্রভেদ দেখা যায় না"। এ্যাসিডের সঙ্গে ক্ষারের প্রশমন ক্রিয়ারও উল্লেখ আছে যাকে

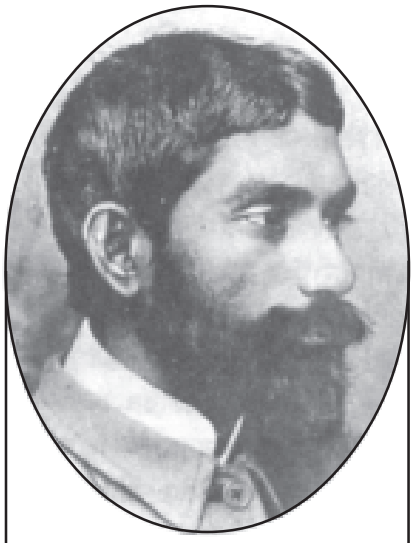

বিজ্ঞান অপেক্ষা করতে পারে। কিন্তু স্বরাজ অপেক্ষা করতে পারে না।

- আত্মচরিত - ১৭৩ পৃঃ

ভিত্তি করে অম্ল, অজীর্ণ ও ক্রিমিনাশক ওষুধ তৈরির একথা বলা আছে। চরক সুশ্রুতের পর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসাশাস্ত্র হল 'অষ্টাঙ্গহৃদয়'। বাগভট সংকলিত এই গ্রন্থে ধাতু ও প্রকৃতিজাত নানা লবনকে ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করার উল্লেখ আছে। একটি শ্লোকে কথা উল্লেখ করেছেন প্রফুল্লচন্দ্র যাতে আছে ৬৪ ভাগ স্নোতোন্ডান (এন্টিমনি সালফাইড), তামা, লোহা, রূপো এবং সোনার প্রত্যেকটির একভাগ মিশ্রিত করে একটি ঢাকা পাত্রে ভস্ম করে ওষুধ তৈরির কথা। এটা একটা উদাহরণমাত্র। 'অষ্টাঙ্গহৃদয়-এ' এরকম শ্লোক আরও আছে। এখানে বিভিন্ন ধাতু, ধাতবলবণ, মধু, হরিতকী ইত্যাদি ব্যবহার করে ওষুধ তৈরির কথা ধাতু নিষ্কাশন বিদ্যার প্রভূত উন্নতি এটি নির্দেশ করে। বাগভটের পর উল্লেখ্য হলো বৃন্দ চক্রপানি এবং মাধবকরের কথা। মাধবকরের 'নিদান' আয়ুর্বেদশাস্ত্র খুব জনপ্রিয় হয়েছিল হিন্দুসমাজে। মুসলিম খলিফারা নির্দেশ দিয়ে এর 'আরবি' তর্জমা করিয়েছিলেন। ধাতু সঞ্জাত ওষুধ ব্যবহারের বৃদ্ধির কথা বৃন্দ ও চক্রপানির গ্রন্থে আছে। সাবান প্রস্তুতের বিবরণ চক্রপানির গ্রন্থে পাওয়া যায়। ওষুধ বিজ্ঞানের যুগে (১৩০০ খৃঃ—১৫০০ খৃঃ) সবচাইতে প্রবাশালী ছিলেন রসায়নবিদ নাগার্জুন। তাঁর গ্রন্থ রসরত্নাকর-এ অনেক ধাতুর শোষণ প্রণালী আছে। পরবর্তীকাল তাঁকে তির্যক পাতন ও দহনপ্রক্রিয়ার উদ্ভাবক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। রসার্ণব, 'রসরত্নসমুচ্চয়' 'রসপ্রকাশ সুধাকর' রসেন্দ্রচিন্তামণি, 'সাঙ্গধর সংগ্রহ' 'রুদ্রযামল' ইত্যাদি গ্রন্থ শিখা পরীক্ষা (Flametest) দ্বারা ধাতু চিহ্নিতকরণের কথা বলেছে। সে যুগে ধাতুর বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার উপায় নিয়ে প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন "A pure metal is that when melted in a crucible does not give off sparks nor bubbles, nor spurts nor emits any sound, nor shows any lines on the surforace but is tanquil like a gem." ধাতুকে বাতাস অথবা গন্ধকের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে ধাতবধর্মবর্জিত এক পদার্থ তৈরি হয়, তাকে 'ধাতুভস্ম' বলে। এরকম বহু ধাতুভস্মের উল্লেখ আছে রসার্ণব গ্রন্থে। "উৎপন্ন পদার্থ সামান্য হাতুড়ির আঘাতেই গুঁড়ো হয়ে যায়, সারিত ধাতু (ভস্ম)-কে তৈল ঘৃত লাক্ষা ও সোহাগার সহিত মিশ্রিত করিয়া মূষার মধ্যে পুরিয়া মুখ বন্ধ করিতে হইবে এবং আগুনে রাখিয়া ক্রমান্বয়ে উত্তাপ প্রয়োগ করিতে হইবে। শীতল হইলে মূষার মুখ খুলিলে দেখা যাইবে যে সারিত ধাতু পুনর্বার মূষ ধাতুতে পরিণত হইয়াছে"। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র নিজে 'রসার্ণব' পদ্ধতি অনুযায়ী পারদভস্ম তৈরি করে দেখেছেন শ্বেতভস্ম আসলে 'মারকিউরাস ক্লোরাইড'। কৃষ্ণভস্ম ও লোহিত ভস্ম দুটিই 'মারকিউরিক সালফাইড' লোহিত ভস্ম আবার প্রস্তুত প্রণালী ভেদে দুটি বস্তু উৎপন্ন করে—হিঁঙ্কুল ও রসবিন্দুর বা মকরধবজ। শেষেরটির বহুল ব্যবহার আমরা আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় পাই। এই পদ্ধতিতে ব্যবহৃত যন্ত্রের গঠন বৈশিষ্ট্যের একটি ভূমিকা আছে যার জন্য রসার্ণবে বলা আছে—

"জারনে সারণেচৈব রসরাজস্যরঞ্জনে
যন্ত্রমেব পরং কর্ম যন্ত্রবিদ্যা মহাবলা

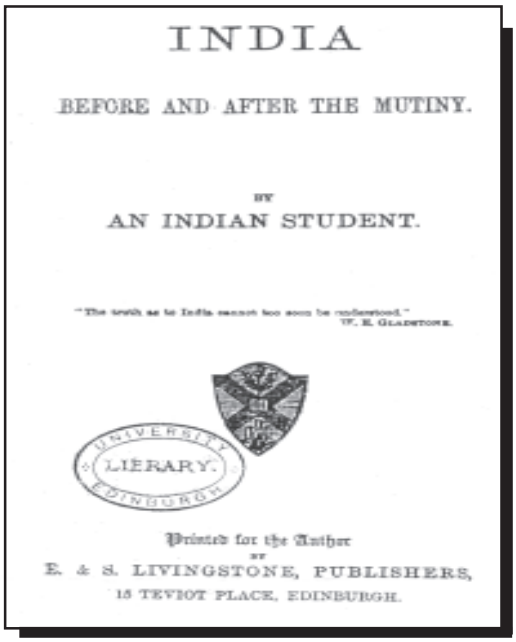
INDIA

BEFORE AND AFTER THE MUTINY.

BY

AN INDIAN STUDENT.

"The truth as to India cannot too soon be understood."
W. E. GLADSTONE.

UNIVERSITY LIBRARY EDINBURGH

Printed for the Author
BY
E. & S. LIVINGSTONE, PUBLISHERS,
15 TEVIOT PLACE, EDINBURGH.

প্রফুল্লচন্দ্র রায় লিখিত প্রবন্ধের প্রচ্ছদ।

ঔষধির হিতশ্চায়ং হঠাৎ যন্ত্রেণ বধ্যতে
তস্মাৎ যন্ত্রবলংচৈকং বিলঙঘং বিজানতা।"

যে সব যন্ত্র ব্যবহৃত হোত তাদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া আছে 'রসার্ণব' গ্রন্থে—সন্দাংশ (Forceps), মুচি (crucible), কাচ কূপী (Glass retorf) ইত্যাদি ইত্যাদি, প্রচলিত ছিল তির্যক পাতন উর্দ্ধপাতন প্রভৃতি প্রক্রিয়া। 'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে পরিপূর্ণ রসশালা (Laboratory) নির্মাণ করার বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া আছে।

কেবলমাত্র ওষুধের প্রয়োজনেই নয় ধাতুশিল্পের জন্য উন্নতমানের উন্নত প্রণালীর ধাতুনিষ্কাশন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। দিল্লীর প্রাচীন লৌহস্তম্ভ বিশ্বখ্যাত এবং অত্যাশ্চর্য নিদর্শন, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা জয় করে অবিকৃতভাবে সে দন্ডায়মান। প্রফুল্লচন্দ্র প্রমাণ করেছেন যে ইস্পাত নির্মাণ প্রণালী ভারতেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। শুধু তাই নয় এত উৎকৃষ্ট ছিল সেই ইস্পাত যা বিদেশেও রপ্তানী হোত। বিখ্যাত 'দামাস্কাস তরবারি'র ইস্পাত ছিল ভারতের ইস্পাত। সম্প্রতি ড্রেসডেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা জানাচ্ছে যে ওই ইস্পাত নির্মাণে Nanotechnology ব্যবহার করা হয়েছে। তার প্রমাণ তারা পেয়েছে। অর্থাৎ এমন Technology ব্যবহৃত হয়েছে যা এখনকার Nanotechnology বলতে যা বোঝায় তা না হলেও সমতুল্য কিছু। প্রফুল্লচন্দ্র জানিয়েছেন অনুর গতিতত্ত্ব ধারণাও তাদের ছিল। সেই সময়কার রসায়নবিদরা তামার উজ্জ্বল বর্ণময় মৃৎশিল্প, তীব্র ক্ষার, গন্ধদ্রব্য, সুগন্ধি ও রঞ্জক প্রস্তুত করতে পারতেন। তাঁরা তামার পাত্রের ভিতর দিকে টিনের প্রলেপ, লোহার পাত্রের উভয় দিকে দস্তার প্রলেপ লাগাতে পারতেন যথাক্রমে বিষক্রিয়া বা মরিচা রোধ করতেন। এমন বিভিন্ন ধরনের চুল্লীর উল্লেখ আছে যা ভারতেই প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায় পাওয়া যায় বিশিষ্ট ইউরোপীয় পণ্ডিত

ম্যাকডোনালের কথা, যিনি জানিয়েছেন ভারতীয়দের কাছ থেকেই নাকের গড়ন ঠিক করার জন্য উপযুক্ত অস্ত্রোপচার পদ্ধ তি শিক্ষা করেছিল ইউরোপ। প্রাচীন ভারতে ১২৭ রকমের অস্ত্রোপচার যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। চুলকে লম্বালম্বি ভাবে দ্বিখন্ডিত করার মতো যন্ত্রও। প্রফুল্লচন্দ্র তাঁর গ্রন্থে কেন ওই উন্নতমানের বিজ্ঞানচর্চার ধারা থেকে আমরা বিচ্যুত হলাম তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। শুধু মাত্র মুসলিম আক্রমণে ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার যা রক্ষিত ছিল বিপুল সংখ্যক সংস্কৃত এবং পালিভাষায় লিখিত পুঁথিপত্রে তার ধবংস সাধনই একমাত্র দায়ী নয়। প্রফুল্লচন্দ্র জানিয়েছেন জাতিভেদপ্রথা কঠোর ভাবে বংশানুক্রমে অনুসৃত হওয়ায় উচ্চবর্ণের মানুষ যারা এককালে ওইসব শিল্পবিজ্ঞানের চর্চা করতেন তারা দূরে সরে গেলেন।

জাতিভেদ প্রথার যান্ত্রিক অপপ্রয়োগে জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চার মূল্যবোধও ক্ষয়িষ্ণু হতে গেল। প্রফুল্লচন্দ্র লিখেছেন "যে দেশে সুশ্রুত বলিয়াছিলেন শবব্যবচ্ছেদ ভিন্ন চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা করা অসম্ভব সে দেশে শব স্পর্শ করাই নিষিদ্ধ হয়ে গেল। যে দেশের অভিজাতবর্গ সুবর্ণরত্ন পরীক্ষা, ধাতুবাদ, ধাতু ও ঔষধ সমূহের সংযোগ ক্রিয়ার জ্ঞান, ক্ষার নিষ্কাশন প্রভৃতি বিবিধ বিদ্যায় ব্যুৎপত্তিলাভ গৌরবের বিষয় বিবেচনা করিতেন সে দেশে স্যাকরা এবং কামারের কাজ অবজ্ঞার বিষয় হইয়া উঠিল। কী এবং কেন—যাহারা বুঝিতে পারিতেন তাহারা নিরাসক্ত হওয়ায় শিল্পগুলির ক্রমোন্নতি বা অগ্রগতিতে পূর্ণচ্ছেদ পড়িয়া গেল, পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের সহিত হিন্দু মনীষার সংশ্রব ছিন্ন হওয়ার ভারতভূমিতে নির্বাচন বা বয়েল-এর আবির্ভাব অসম্ভব হইয়া উঠিল।"

বিভিন্ন বিষয়ে প্রাচীন ভারতের বিশাল জ্ঞানভান্ডারের অনেকাংশই এখনও অনাবিষ্কৃত। মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বা রক্ষিত এই জ্ঞানভাণ্ডার সমন্বিত পুঁথিগুলির পুনরুদ্ধার ও পাঠোদ্ধার প্রয়োজন। তার জন্য সংস্কৃত ভাষায় নৈপুণ্য সহ পণ্ডিত ব্যক্তিদের দরকার। দরকার প্রফুল্লচন্দ্রের মতো অনুসন্ধিৎসু মনীষার। এর প্রয়োজন আমাদের সংসদে গৃহীত জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬-তে স্বীকৃত হয়েছে। বলা হয়েছে শিক্ষানীতি—দলিলের পঞ্চ ম অধ্যায়ের ৩৩তম ধারায়... "Effort will be made to delve into India's ancient fund of knowledge and to relate it to the contemporary reality. This effort will imply the development of facilities for the intensive study of sanskrit and other classical languages." কিন্তু পাশ্চাত্যাভিমুখী বিকৃতমনা পদাধিকারী মানুষ বা রাজনৈতিক নেতাদের অনীহার এই 'effort'-কে কার্যকরী হতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই জাতির জন্য অন্তত আরও একজন প্রফুল্লচন্দ্রের দরকার এই মুহূর্তে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়
সমাজ নির্মাণের সাধনা

ডঃ প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪) নিছক একজন বিজ্ঞান তাপস ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন স্বদেশ প্রেমিক। তাঁর স্বদেশপ্রেম মূলত দুটি খাতে প্রবাহিত হয়েছিল—ইতিবাচক ও নেতিবাচক। ইতিবাচক দিক থেকে তিনি ছিলেন স্বদেশী শিল্পের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। অগ্রণী সংগঠক। বিদেশী প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তিনি বুঝেছিলেন দেশীয় শিল্পের বিকাশের অন্তরায় হলো উদ্যোগের অভাব, মূলধনের স্বল্পতা নয়। পেশাদারী কলাকৌশল সঠিকভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শুধুমাত্র বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে আলোড়ন সৃষ্টি করেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। আত্মশক্তির ভিত্তিতে নিজেদের এগোতে হবে। জীবনের সায়াহ্নে ১৯৪০ সালের ডিসেম্বরে প্রদত্ত ভাষণে তিনি দেশবাসীকে চাকুরির মিথ্যা মোহজাল থেকে মুক্ত হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে শিল্প-বাণিজ্য ব্যবসায়ে মন দিতে আহ্বান জানান। আচার্য রায় নিছক বাগ্যবাগীশ ছিলেন না, বাস্তব জীবনে তিনি শিল্পদ্যোগে স্বয়ংক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাত্র ৮৮০ টাকায় ১৮৯২ সালে নিজ বাসভবনে 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস' গড়ে তোলেন। বছর পাঁচেক পরে বেঙ্গল কেমিক্যাল একটি লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়। মানিকতলা, সোদপুরে কারখানার পরিকাঠামো গড়ে উঠল। বেঙ্গল কেমিক্যাল স্বদেশী শিল্প বিকাশের ইতিহাসে এক গৌরবময় পদক্ষেপ।

কিন্তু আচার্য রায় বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবনে ছিলেন এক বিশালাকায় বটবৃক্ষ স্বরূপ ব্যক্তি। যশোহর জেলার (বর্তমানে খুলনা) রাড়ুলি গ্রামে ১৮৬১ সালের ২রা আগস্ট জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের সন্তান প্রফুল্লচন্দ্র গ্রামীণ জীবনে সামাজিক অনাচার, অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।

কিন্তু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন আচার্য রায় উদাসীন টেস্ট টিউব সর্বস্ব বিজ্ঞানী ছিলেন না। ১৯২০ সালের পর তিনি জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে নিজেকে নিক্ষিপ্ত করেন। একদিকে তিনি সামাজিক সংহতির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। তাই বাংলায় নিম্নবর্ণজাত মানুষের প্রতি অবিচার ছুঁৎমার্গের বিরুদ্ধে ধিক্কার জানিয়েছিলেন। যদি

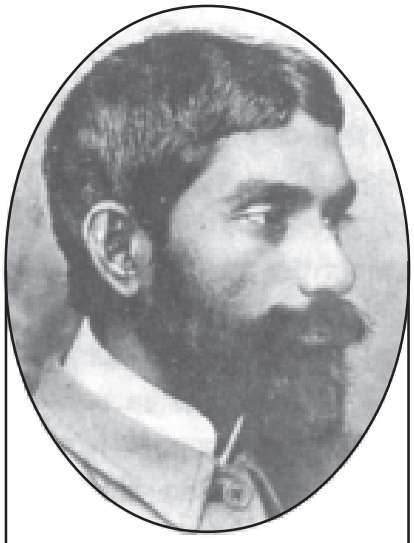

বিজ্ঞান সম্পর্কীয় কাজ বা শিল্পে তাহার প্রয়োগ। দেশের অর্থনৈতিক দুর্দশা মোচন। এই কাজেই আমি প্রধানত মন দিয়াছি।

নিম্নবর্ণজাত মানুষের প্রতি অবজ্ঞা ও উপেক্ষা চলতে থাকে, তাহলে সামাজিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়বে। আর বর্ণ হিন্দুদের অত্যাচার থেকে নিষ্কৃতি পাবার আশায় ইসলাম ধর্মের প্রতি ঝুঁকবে। ইতিমধ্যে আত্মজীবনী গ্রন্থে আচার্য রায় একটি অধ্যায়ে (''Caste System–its Baneful effect on Hindu Society'') দেখিয়েছিলেন জাতি গঠনের জন্য বৈষম্যমূলক জাতিভেদ প্রথার নিবারণ চাই। এরই পাশাপাশি বাংলার সমাজ জীবনে ইসলামের শক্তিবৃদ্ধি র পরিণাম কি হতে পারে সে বিষয়ে সতর্ক করেছিলেন।

আচার্য রায় ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, জাতীয়তাবাদী, তাই তিনি সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে উঠে জাতিভেদ ব্যবস্থা ও ইসলামের সংখ্যাবৃদ্ধি —এই দুই সমস্যার সদর্থক সমাধান চেয়েছিলেন।

ফরিদপুরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে (১৯২৫ খৃঃ) সভাপতির ভাষণে আচার্য রায় হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগত হ্রাস বৃদ্ধি দেখিয়ে হিন্দু সমাজের অন্তর্নিহিত দুর্বলতার বিষয়ে সতর্ক করেছেন। জাতিভেদ প্রথার সংস্কার না হলে হিন্দুদের শক্তিহানি অবধারিত এবং এর পরিণামে মুসলমানদের প্রসার প্রতিহত করা সম্ভব নয়। ওই অনুষ্ঠানে স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী উপস্থিত ছিলেন। গান্ধীজী হরিজন আন্দোলনের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের ভেদাভেদ দূর করতে চেয়েছিলেন। মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিল রূপে আচার্য রায়ের ভাষণটি পাঠকদের উদ্দেশ্যে পরিবেশিত হলো।

ফরিদপুর প্রাদেশিক হিন্দু সভা

সভাপতির অভিভাষণ

[১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এই অভিভাষণ প্রদত্ত হয়]

প্রায় ২০ বৎসর গত হইল আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যে বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, তাহা আজ অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দ Hindus–A Dying Race গ্রন্থ রচনা করেন। নিম্নে যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দেখিলেই বোধগম্য হইবে হিন্দু জাতি আজ কি প্রকারে ধবংসের পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে।

প্রতি দশ বৎসরে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি (প্রতি দশ হাজারে) ঃ

	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১
হিন্দু—	৪৮৮২	৪৭৬৭	৪৭০০	৪৫২৩	৪৩৭২
মুসলমান	৪৯৬৯	৫০৬৮	৫১১৯	৫২৩৪	৫৩৭৫

এই হতভাগ্য দেশে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা প্রভৃতি কালান্তক ব্যাধি মৌরুসী পাট্টা করিয়া রহিয়াছে। হিন্দু মুসলমান এই সমস্ত ব্যাধির সমভাগী; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও হিন্দুর সংখ্যা কেন দিন দিন হ্রাস হইতেছে? ইউরোপীয় জগতে কি প্রকারে সন্তান উৎপাদন (Birth Control) বন্ধ করা যায়, তাহার উপায় উদ্ভাবন হইতেছে; কিন্তু বাংলাদেশে হিন্দু সমাজে আমাদের আত্মকৃত দূষণীয় প্রথাই ইহা সংসিদ্ধ করিতেছে। ইহার প্রধান কারণগুলি, যথা—

(১) বিবাহযোগ্য পাত্রীর অভাব,

(২) বিধবার, বিশেষত বাল্যবিধবার, বাধ্যতামূলক পুনর্বিবাহ

নিষেধ।

দেখা যায় যে, প্রায় সমস্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের সংখ্যা বেশী;কিন্তু বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর বিবাহ-প্রথা রহিত হওয়ায় অনেক সময় কন্যা পাত্রস্থ করা দায়। আবার অপরপক্ষে পাত্রের উপযুক্ত কন্যা পাওয়াও দুষ্কর। বারেন্দ্র রাঢ়ীর সহিত, আবার উত্তর রাঢ়ী দক্ষিণ রাঢ়ীর সহিত ক্রিয়াকর্ম্ম করিতে নারাজ। হিন্দু সমাজে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে পণ বিনা পাত্রী পাওয়া দায়। এই কারণে অনেক ৪০ বৎসর গত হইলে পৈতৃক ভদ্রাসন বন্ধক দিয়া একটি অপরিণত বয়স্কা বালিকা বিবাহ করেন। অনেকের ভাগ্যে বিবাহ ঘটিয়া উঠে না। ফলে এই দাঁড়ায় যে, বালিকাবধূ ১৫-২০ বৎসর বয়সেই বিধবা হইয়া যায়। এই কারণেই বাংলা দেশে কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত প্রভৃতি শ্রেণী একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং পশ্চিম দেশীয় খোট্টারা আসিয়া ইহাদের স্থান অধিকার করিতেছে সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, অনেকে শ্রেণী ও উপশ্রেণীর মধ্যে পুরুষেরা পাত্রীর অভাবে অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হয়, পরন্তু সহস্র সহস্র বালবিধবাগণ সামাজিক রীতি অনুসারে পুনর্বিবাহ করিতে পারে না। কিন্তু নৈসর্গিক গতি অবরোধ করে কে? উপপত্নী ও রক্ষিতা-নারী সমাজের ভিতর ছড়াইয়া পড়িতেছে— পাপস্রোত ও ভ্রূণহত্যাপাতকে দেশ প্লাবিত। প্রায় ৭০ বৎসর হইল প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার "বিধবাবিবাহ" বিষয়ক গ্রন্থের উপসংহারে জ্বালাময়ী বাণীতে যে হৃদয় বিদারক আর্তনাদ করিয়াছিলেন তারা যেন এখনও আমার কর্ণকুহরে ধ্বনিত হইতেছে। আমি জানি অনেক হিন্দু বিধবা এই প্রকার কলঙ্কময় জীবন যাপন করা অপেক্ষা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ হওয়া শ্রেয় জ্ঞান করেন।

কৃষিশিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রফুল্লচন্দ্র।

সামাজিক দুর্নীতি ও কুসংস্কারের দাস হইয়া হিন্দুগণ মুসলমানের সহিত জীবন সংগ্রামে প্রতিনিয়ত পরাজিত হইতেছে, এবং জীবনযাত্রা নির্বাহের অনেক ক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত হইতেছে। বাংলাদেশের বড় বড় জাহাজ প্রতিনিয়ত সমুদ্রবক্ষে চলিতেছে। ইহাদের সারেং, খালাসী প্রভৃতি পূর্ব বাংলার চাষী মুসলমান শ্রেণী হইতে সংগৃহীত। মুসলমান রেঙ্গুন, আকিয়াব, মেসোপটেমিয়া প্রভৃতি দূরদেশে শ্রমিকভাবে যাইয়া প্রভূত অর্থ উপার্জন করে এবং দেশে পাঠায়। আমি জানি চাটগাঁয়ের অনেক গ্রামে এই প্রকারে প্রতি মাসে ৪০।৫০ হাজার টাকা মানিঅর্ডার হইয়া আসে। তা ছাড়া পদ্মায় চর পড়িলেই দুঃসাহসিক মুসলমান আসিয়া আবাদ করিতে আরম্ভ করে। প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র মুসলমান চাষী আসামের উর্বরা উপত্যকায় যাইয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতেছে। কিন্তু হিন্দু অলস ও কুসংস্কার জালে জড়িত, ছুঁৎমার্গ ও জাতিচ্যুতির ভয় তাহাকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিয়াছে। সে পৈতৃক ভদ্রাসন ছাড়িয়া যাইতে রাজী নয়;এই কারণে সে দরিদ্র ও নিরন্ন হইয়া পড়িতেছে।

জাতিভেদরূপে ব্যাধিজর্জরিত হিন্দু প্রতিপদে শৃঙ্খল গড়িয়া নিজেকে আবদ্ধ করিয়াছে। ধোপা কুমোরের কাজ করিবে না, কুমোর কামারের কাজ করিবে না। কিন্তু মুসলমানদিগের কোনওপ্রকার বাধাবিপত্তি নাই; সে নিজের রুচি ও ইচ্ছানুযায়ী যে কোনও ব্যবসা অবলম্বন করিতে পারে। এই কারণে চামড়া ও দপ্তরীর ব্যবসায় মুসলমানদিগের একচেটিয়া।

বাঙলাদেশে প্রায় ১৮ লক্ষ উড়িয়া ও হিন্দুস্থানী আসিয়া অনেক বিভাগে জীবিকা অর্জ্জন করিতেছে, এবং অজস্র টাকা রোজগার করিয়া স্ব স্ব প্রদেশে পাঠাইতেছে; কিন্তু আমরা "হা অন্ন, হা অন্ন" করিয়া চীৎকার করিতেছি ও হাত পা গুটাইয়া বসিয়া আছি। নিম্ন শ্রেণীর অনেক হিন্দু শ্রমবিমুখ হইয়া অনায়াসলভ্য জীবিকা অর্জনে ব্যস্ত, এই কারণে বৈরাগী ও বৈরাগিণীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, এবং গেরুয়াধারীরও অভাব দেখা যাইতেছে না। বাবাজী ও স্বামীজী পাতালফোঁড়ের ন্যায় গজাইয়া উঠিতেছে।

কতকগুলি প্রকৃত ঘটনা বিবৃত করিলাম, এবং হিন্দু সমাজ আজ যে কি প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত তাহাও কিছু কিছু জানাইলাম। এখন উপযুক্ত ঔষধ ও পথ্য প্রয়োগের দরকার।

১। বিধবাবিবাহ প্রচলন।

২। যে সমস্ত কুলবধূ প্রতিনিয়ত আমাদের গৃহ হইতে অপহৃত হইতেছে, এবং দুর্বলতা ও কাপুরুষতা প্রযুক্ত যাহাদিগকে আমরা দুর্বৃত্তের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারি না, তাহাদিগকে উদ্ধার করা ও সমাজের বক্ষে স্থান দেওয়া।

৩। অস্পৃশ্যতা বর্জন। যদি আমাকে কোন বিদেশী জিজ্ঞাসা করেন ৩০ কোটি ভারতবাসী কেন আজ মুষ্টিমেয় পরদেশীর পদানত ও ক্রীড়ার পুত্তলি? আমি এক কথায় তাহার উত্তর দিই—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। যদি আমাকে কেহ জিজ্ঞাসা করেন, স্বরাজলাভের প্রধান পরিপন্থী কি? আমি এক কথায় উত্তর দিব—অস্পৃশ্যতারূপ অভিশাপ। সভা সমিতিতে বড় বড় শাস্ত্রের বচন আবৃত্তি করি যথা—"সর্ব্বভূতেষু নারায়ণ" কিন্তু তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর কেহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলেও যদি এক গেলাস জল কোন সামাজিক নিমন্ত্রণে দেয়, তখনই জাতিচ্যুত হইলাম বলিয়া পংক্তি সমেত উঠিয়া পালাই। সোডা, লিমনেড পান করিব, বরফজল খাইব—যেন সেগুলি নৈকষ্য কুলীন শুদ্ধ স্নাত পূত হইয়া গায়ত্রী করিতে করিতে গঙ্গাজল দিয়া প্রস্তুত করে। স্টীমারে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে বাবুর্চ্চির নিকট যাইয়া এক প্লেট মুরগীর কারি ও ভাত লইয়া অক্লেশে উদরস্থ করিব। এই সমস্ত ব্যাপারে হিন্দুত্বের কিছুমাত্র বিচ্যুতি হয় না। কলিকাতায় এবং অন্যান্য সহরে এখনকার দিনের যত রাঁধুনী ব্রাহ্মণ প্রায়ই খোট্টা, না হয় উড়িয়া। তাহাদের জ্ঞাতি গোত্রের কোন খবর রাখি না—চেহারা দেখিলে অনেক সময়

ডোম কি চামার বলিয়া মনে হয়;কিন্তু একগুচ্ছ সূত্র গলদেশে প্রলম্বিত হইলেই হিন্দুত্ব বজায় থাকে। অনেক সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বন্ধু আমাকে বলিয়াছেন যে, এই সকল বামুন যাহারা পরিবার সঙ্গে আনে না, তাহাদের অনেকেরই স্বভাব চরিত্র কলুষিত, এবং শতকরা ৯৫ জন কদর্য্য ব্যাধিগ্রস্ত। সনাতন হিন্দুধর্ম ইহাদের হস্তে প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন না। অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। ভণ্ডামী ও কপটাচরণ ধর্ম্মের প্রধান আবরণ হইয়াছে; দেশাচার ও লোকাচার ধর্ম্মের সিংহাসন অধিকার করিয়াছে।

যাঁহারা লোকতত্ত্বের (Ethnology) বিষয় কিছুমাত্র আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে, আজকালকার তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর রক্তে অনার্য্য ও দ্রাবিড়ীয় শোণিতের যথেষ্ট সংমিশ্রণ আছে। ক্ষত্রবংশাবতংস রাজপুতগণ শক ও হুণ বংশোদ্ভব। হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে অবাধে গলাধঃকরণ করিয়া হজম করিয়াছে। আসামের অহোম, কুচবিহার ও ত্রিপুরার নৃপতিগণও এই প্রকারের ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিয়াছেন। একসময়ে প্রায় সমস্ত বরেন্দ্রভূমি কুচবিহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বারেন্দ্র শ্রেণীর রক্তে যথেষ্ট পরিমাণে মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ আছে। বাংলাদেশ হাজার বৎসরের অধিক কাল বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল তখন প্রকৃতপক্ষে একাকার হইয়া গিয়াছিল। যখন আদিশূর ও বল্লাল সেনের সময় পুনরায় ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তার করে, তখন কত রকম গলদ যে সমাজ মানিয়া লইলেন, তাহার আলোচনার সময় নাই। যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, আদিশূর কর্তৃক কান্যকুব্জ হইতে নিমন্ত্রিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ হইতে বাংলায় ১৩ লক্ষ ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, তাঁহাদিগের সহিত তর্ক করিতে চাহি না। ইতিহাসে আছে কিনা জানিনা, যে তাঁহারা স্বীয় স্বীয় পত্নী সমভিব্যাহারে আসিয়াছিলেন। আবার সপ্তসতী ব্রাহ্মণেরাই বা কোথায় গেলেন? লোকতত্ত্বের অকাট্য প্রমাণের নিকট সকল যুক্তিই পরাস্ত। নাসিকার ছিদ্র (nasal slit) ও মুখের সৌষ্ঠব ও আকৃতি (facial contour) প্রভৃতি দ্বারা বিচার করিলে বাংলাদেশে তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর ও নমঃশূদ্র, ব্রাত্যক্ষত্রিয়, মাহিষ্য প্রভৃতির মধ্যে কিছুমাত্র পার্থক্য দৃষ্ট হইবে না। যদি সুবর্ণবণিকগণের পূর্বপুরুষগণ বল্লাল সেনকে ক্রমান্বয়ে মুদ্রা ধার দিয়া এবং তাহা ফিরিয়া পাইবার আশা জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় ঋণ দিতে অস্বীকৃত না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহারাও আজ কৌলিন্য মর্য্যাদা হইতে বঞ্চি ত হইতেন না। হায়রে বর্তমান হিন্দু সমাজ—ধন্য তোর মহিমা! বেদ সঙ্কলয়িতা ও মহাভারত রচয়িতা মহামুনি ব্যাস মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন—মহর্ষি বশিষ্ঠ ও দেবর্ষি নারদ কেহ বা দাসী-পুত্র কেহ বা বেশ্যাপুত্র। সনাতন হিন্দুধর্ম কি তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করেন?

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা
পঞ্চ কন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনং॥"

কই, সীতা সাবিত্রীর নাম করা হয় না কেন? ইহার তাৎপর্য্য এই যে, এক সময়ে হিন্দুধর্ম কি প্রকার উদার ছিল। যে সকল বিধবা পুনর্বিবাহ করিয়া আদর্শ সতী হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই স্মরণ করিতে হইবে। সে একদিন, আর আজ এক দিন। মুসলমানগণকে বাদ দিলেও বাঙলায় মোটামুটি ২০০ লক্ষ হিন্দু, তাহার মধ্যে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য মাত্র ২৫।২৬ লক্ষ—অষ্টমাংশ মাত্র। আমি জিজ্ঞাসা করি ইঁহারাই কি চিরকাল সমাজে আধিপত্য করিয়া আসিবেন? দুই হাজার বৎসর পূর্বের ঈশপ্ বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে, উদর ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সহিত ঝগড়া বাধিলে অনশনে প্রাণত্যাগ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এই অবজ্ঞাত, নির্য্যাতিত, অশিক্ষিত তথাকথিত নিম্নশ্রেণী আমাদেরই রক্তমাংস! দৈহিক শক্তি ও বল হিন্দুসমাজে যাহা কিছু আছে, তাহা ইহাদেরই মধ্যে বিদ্যমান। ইহাদিগকে বাদ দিয়া হিন্দুসমাজ কোথায় দাঁড়াইবে? ঘরশত্রুতে রাবণ নষ্ট। একদিকে হিন্দু মুসলমানের বিরোধ—অপরদিকে আমাদের মধ্যে আত্মকলহ। এই ঘরোয়া বিবাদ বিসম্বাদ লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিব, না এই সমস্ত মিটমাট করিয়া সকল শ্রেণীকে কোলে টানিয়া লইয়া স্বরাজ-লাভের সোপান নির্মাণ করিব?

এখন বুঝা যাইতেছে কেন হিন্দুর উৎপাদিকা শক্তি হ্রাস হইয়া আসিতেছে। হিন্দু সমাজের লোকসংখ্যা হ্রাসের আর একটি প্রধান কারণ এই—ইদানীং আবার সমাজের নিম্নস্তরের হিন্দুগণ আভিজাত্যগর্বে স্ফীত হইয়া বৈশ্যত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্নের চেষ্টা করিতেছেন। ইহার প্রধান ফল এই দাঁড়াইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকেরা যে প্রকার সামাজিক রীতিনীতি ও চলাচল অনুসরণ করে ইহারাও সেই পথাবলম্বী হইতেছে। কতকগুলি তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল;কিন্তু এখন তাহারা ইহা বর্জন করিয়াছে। এই কারণে হিন্দু সমাজের প্রত্যেক স্তরে যে কেবল উৎপাদিকাশক্তি কমিতেছে তাহা নহে, ভ্রূণ ও শিশু হত্যা সেই অনুপাতে বাড়িতেছে। ১৯২১ সালের আদমসুমারীতে দেখা যায় সমগ্র বাঙলার লোক সংখ্যার মধ্যে মোটামুটি ২ কোটি হিন্দু এবং ২॥০ কোটি মুসলমান, বাকী শতকরা ৪ ভাগের কম খৃষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতি অন্য ধর্মাবলম্বী। অথচ ৫০ বৎসর পূর্বে (১৮৭১ খৃঃ অব্দে) হিন্দুর সংখ্যা মুসলমান অপেক্ষা ৪ লক্ষ অধিক ছিল।

নিম্নে বঙ্গদেশের হিন্দু ও মুসলমান বিধবার যে তালিকা প্রদত্ত হইল তাহা দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, কেন আমাদের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভ্রাতৃগণ সংখ্যায় আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাইতেছেন।

বিধবা	হিন্দু বিধবা	মুসলমান বিধবা
১—৫	১৪৩৯	১৪০৬
৬—১০	৮৭৫১	৭৫৫৮
১০—১৫	৩৬৩২৩	২৩৪৮০
১৫—২০	৯৬৪৭০	৫২১৭৯
২০—২৫	১৫১০৮৬	৭২৫৯৮
২৫—৩০	২৩০৭৯০	১২৪৪৬৯

ছুঁৎমার্গগ্রস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদিগের অবজ্ঞা ও উদাসীনতার ফলে অবনত শ্রেণীর লোকেরা দলে দলে মুসলমান ও খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিতেছে। কেনই বা করিবে না? ইসলাম ধর্মে সাম্যবাদের পরাকাষ্ঠা বিদ্যমান। ডোম হউক, বাগদী হউক, সে যে দিন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সেই দিন হইতে সে সমস্ত সামাজিক অধিকার অন্যের সহিত

সমভাবে ভোগ করে। একসঙ্গে, এমন কি এক পাত্র হইতে ভোজন, এক মসজিদে ভগবানের উপাসনা হইতে সে বঞ্চি ত হয় না। ইহা ছাড়া খৃষ্টান মিশনারীরা তাহাদের শিক্ষা, চিকিৎসা ও ভাবী জীবিকা অর্জনের যথেষ্ট সহায়তা করেন। এক কথায় বলিতে গেলে হিন্দু সমাজ কেবল পায়ে ঠেলিতে পারে, কোলে টানিয়া আনিবার শক্তি তাহার নাই। সম্প্রতি নিমন্ত্রিত হইয়া আমি সপ্তাহকাল "অভয় আশ্রমের" আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেখানে যে দিব্য দৃশ্য দেখিলাম তাহাতে আমার বড়ই তৃপ্তিলাভ হইল। সেখানে হিন্দু মুসলমানের বাদ-বিচার নাই—সেবক হইলেই হইল। এবং অনেক সময় চামার, মেথর, ভদ্রলোকের সন্তানগণের সহিত পাশাপাশি বসিয়া আহার বিহার করেন। কুমিল্লা সহরের মেথরগণ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া যখন আহার করিতে লাগিল, তখন মনে অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চ ার হইল। শুধু তাহাই নহে, এই সমস্ত অবজ্ঞাত ও পদদলিত লোকের বাবুদের সঙ্গে একাসনে বসিয়া আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান বাড়িল। হিন্দু সমাজ ইহাদিগকে ইতর জীব-জন্তু অপেক্ষা ঘৃণা করে, এবং কোণঠেসা করিয়া রাখিয়াছে। একটা বিড়াল আস্তাকুঁড় বেড়াইয়া পচা ইন্দুরের মাংস ভক্ষণের পর রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া কড়ায় মুখ দিয়া চপ্ চপ্ করিয়া দুধ খাইতেছে, কখনও কখনও বা থাবা দিয়া পাত হইতে মাছের মুড়া লইয়া যাইতেছে—ছুঁৎমার্গীদের ইহাতে কোনও আপত্তি হয় না—অম্লানবদনে সেই দুধ পান করে ও সেই পাতে বসিয়া ভোজন করে; কিন্তু তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতির কেহ রান্নাঘরের চৌকাঠ উত্তীর্ণ হইলে একরশি তফাতে ভাতের হাঁড়ি, অন্ন ব্যঞ্জনাদি তৎক্ষণাৎ অপবিত্র হইল বলিয়া পরিত্যক্ত হয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই বলিয়াছেন যে, এখন রান্নাঘরে ও ভাতের হাঁড়ির ভিতর হিন্দুধর্ম আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, অর্থাৎ দেশাচার, লোকাচার ও কপটাচার ধর্মের দোহাই দিয়া বিরাজ করিতেছে।

নারী কল্যাণ সমিতিতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়।

হিন্দু ও মুসলমান কয়েক শত বৎসর ধরিয়া নির্বিবাদে পাশাপাশি বাস করিতেছে। যাহা কিছু মনোমালিন্য ও বিবাদ বিসম্বাদের কারণ তাহা পরপদলেহনকারী চাকরিজীবী শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ । এ বিষয়ে সেদিন আমি হিন্দু মহাসভার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণে যাহা বলিয়াছি তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন।

বাংলাদেশ অজ্ঞতায় তমসাচ্ছন্ন—শতকরা ৫।৭ জন মাত্র বর্ণজ্ঞানবিশিষ্ট। এই সমস্ত কুসংস্কার তিরোহিত করিতে হইলে লোকশিক্ষা বিস্তার সর্বাগ্রে প্রয়োজন। যাহাতে প্রত্যেক গ্রামে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষালাভ করিতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। বিশেষতঃ বালিকাগণের মধ্যেও শিক্ষার আলোক প্রবেশ করাইতে হইবে। গভর্ণমেণ্টের দিকে চাহিয়া থাকিলে আর চলিবে না।

উপসংহারে আবার বলি, এখন আর তর্ক যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই দিবার দিন নাই। বাঙলায়—বিশেষত পূর্ব ও উত্তর বাঙলায়—হিন্দুজাতি ধ্বংসের পথে চলিয়াছে—স্বেচ্ছাকৃত আত্মহত্যা করিতেছে। এখনও যদি আমাদের মোহ নিদ্রা না ভাঙ্গে তাহা হইলে ২০০।২৫০ শত বৎসরের মধ্যে হিন্দুজাতি ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। এখন আর কথায় চিঁড়া ভিজাইবার চেষ্টা করিলে হইবে না, কাজ করিতে হইবে ও কাজে দেখাইতে হইবে যে, আমরা প্রকৃতই এই ধ্বংসোন্মুখ জাতি সংরক্ষণে প্রস্তুত। এই হিন্দুসভায় তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীদিগকে অনাচরণীয়রূপ অবজ্ঞা হইতে মুক্ত করিতে হইবে। তাহাদিগকে "জলচল" করিতে হইবে। যদি সাহস না কুলায় জানিলাম যে আমাদের বক্তৃতা ও আস্ফালন ফাঁকা আওয়াজ মাত্র। যিনি নব্য ভারতের উদ্ধারকল্পে যুগাবতাররূপে অবতীর্ণ—জগতের সেই শ্রেষ্ঠ মানব, মহাত্মা গান্ধী স্বয়ং এই সভায় উপস্থিত। ইনি আমাদের স্বরাজলাভের যে পতাকা উড্ডীয়মান করিয়াছেন, তাহাতে খদ্দর প্রচলন, অস্পৃশ্যতা বর্জন ও হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রীতিস্থাপন মূলমন্ত্রস্বরূপ স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। তাঁহার সমক্ষে সকলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হউন যে, আজ হইতে এই সমস্ত সামাজিক দুর্নীতি ও কলঙ্ক অপসারিত করিব। হিন্দুসমাজ আবার নবজীবন লাভ করিয়া জগতের সমক্ষে মস্তক উত্তোলন করুক। যাঁহার আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোনও সাধনা সিদ্ধ হয় না, সেই সর্বশক্তিমান ভগবানের কৃপা ভিক্ষা করিয়া আমি আসন পরিগ্রহ করিলাম।"

কিন্তু আচার্য রায়ের সতর্কবাণী অবশ্য বাঙালি হিন্দুদের উপর তেমনভাবে প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই দুই দশক পর মুসলিম লীগ ও নমঃশূদ্র জাতি যৌথভাবে পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হয়। পরিণাম দেশ বিভাগ-হিন্দুদের লাঞ্ছনা ও দেশত্যাগ।

[প্রসন্ন কুমার রায় সংকলিত "আচার্য-বাণী" গ্রন্থ (কলকাতা, ১৯৪৬) থেকে সংগৃহীত]

সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়

অজিত কুমার বিশ্বাস

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন একজন খদ্দর পরিহিত সন্ন্যাসী বৈজ্ঞানিক। এত বড় বৈজ্ঞানিক তবু তাঁর জীবনে অহংকার, আড়ম্বর বা বিলাসিতা ছিল না। আচার্যদেবের জন্ম ১৮৬১ সালে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলী গ্রামে। ১৮৭১ সালে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া শেষ করে কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে ২ বছরে তিনি সংস্কৃত, ল্যাটিন, গ্রীক ও ফরাসী ভাষা শিখলেন। পিতামাতাকে না জানিয়ে গিলখ্রাইষ্ট বৃত্তির জন্য পরীক্ষা দেন। সারা ভারতে প্রফুল্লচন্দ্র ছাড়া আর একজন এই বৃত্তি পেয়েছিলেন। এই বৃত্তির ফলেই তিনি বিলেতে এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডি. এসসি ডিগ্রি নিয়ে ভারতে আসেন। এই সময় ওই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ছাত্রদের "সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে ভারতবর্ষ," বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখতে বলা হয়। প্রফুল্লচন্দ্র মেধাবী ছাত্র, তায় দেশহিতৈষী। স্বভাবতই তাঁর এই প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় যোগ দেবার ইচ্ছা হলো। প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার ফল যখন বেরোল তখন তিনি প্রাইজ অবশ্য পেলেন না। কিন্তু তার প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ দুটির একটি বলে ঘোষিত হলো। তিনি 'গিলখ্রাইষ্ট এনভায়রণমেন্ট' থেকে আরও ৫০ পাউন্ড বৃত্তি পেলেন এবং সে সময় 'হোমপ্রাইজ' বৃত্তিও পেলেন। সেই যুগে বিলেতেও ডক্টরেটের এত ছড়াছড়ি ছিল না। সুতরাং প্রফুল্লচন্দ্র বিদেশেও একটা প্রতিষ্ঠা পেলেন। তিনি সেখানেই ইউনিভার্সিটি কেমিক্যাল সোসাইটির সহসভাপতি নির্বাচিত হলেন।

দেশে ফিরবার সময় ডাঃ রায় চেষ্টা করেছিলেন এখানে একটা ভাল কাজ যাতে পান। ডাঃ রায় বিলেতে মহামহারথীদের শংসাপত্র নিয়েও কিছু সুবিধা করতে পারলেন না। অগত্যা কাজ না নিয়েই দেশে ফিরে আসেন। হাতে কোন টাকাও ছিল না। গিলখ্রাইষ্ট ফান্ড পথ খরচা ৫০ পাউন্ড দিলেন। ১৮৮৮ সালের আগস্ট মাসে তিনি দেশে ফিরলেন। জাহাজের হেড পার্সারের কাছ থেকে ৮ টাকা ধার নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে এক বন্ধুর বাড়ী গিয়ে বিলেতি পোষাক ছেড়ে দিয়ে একটি ধুতি চাদর ধার করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের জীবন ছিল সহজ সরল। এই বিষয়ে আচার্যদেবের ছাত্র চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য লিখেছেন—

"১৯০১ সালে আচার্যদেবকে প্রথম দেখলুম প্রেসিডেন্সী কলেজে। তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি। রুটিনে দেখলুম প্রফুল্লচন্দ্র রায় আমাদের ক্লাস নেবেন। প্রথম দিনের ক্লাস, ছুটতে ছুটতে গিয়ে গ্যালরিতে এসে বসলুম। দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল। বেয়ারা

এসে রেজেস্টারি দিয়ে গেল। দেখি, বেয়ারার গায়ে চৌখুপি ছিটের সুতির একটা কোট। এবার প্রবেশ করলেন আচার্যদেব। দেখি, তাঁর গায়ে অবিকল সেই এক ধরনের কোট। এটা কেমন করে হলো ঠিক বুঝলাম না।

বিকেলে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসে ডিমন্সট্রেটর গুণীবাবুকে কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন,—একটা থান কিনে চারটে কোট করান। দুটো বেয়ারাটাকে দিয়েছেন, দুটো নিজে পরেন।

আচার্য রায়ের সত্তর বছর পূর্ণ হলে দেশবাসী এক বিরাট সভায় তাকে অভিনন্দিত করে। এই উপলক্ষ তাঁকে একখানি স্মারক-গ্রন্থ উপহার দেওয়া হয়। বহু মনীষী তাদের লেখা দেন। সেই স্মারক-গ্রন্থে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু লিখেছেন,—

"The association of plain living and high thinking is always very rare in addition to these there is in sir P.C. Roy the element of vigorous action which knows no rest. The combination of such qualities in a single individual is indeed rare in any country, and there can be no higher example for the young generation to emulate than the life of this great teacher."

গান্ধীজী ১৯০১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে প্রথম কলকাতায় আসেন। আচার্যদেবের বন্ধু গোখেলের বাড়িতে তিনি ছিলেন। আচার্য রায় গান্ধীজীকে আজকের কফি হাউসে প্রথম সভা করে ভারতবাসীর সাথে প্রথম পরিচয় করান। গান্ধীজী আচার্যদেবের ৭০ বছরপূর্তি উপলক্ষে স্মারক গ্রন্থে একটি লেখা পাঠান। গান্ধীজী তখন ইয়ারবেদা জেলে ছিলেন। সেখান থেকে লেখেন—

"Acharya Roy I had the privilage of knowing for the first time when Gokhale was his next door neighbour in 1901 and I was undergoing tutelage under the latter. It was difficult to belive that the man is simple Indian dress and wearing simple manners could possibly he the great scientist and Professor he even then was. And it took by breath away when I heard that out of his **princely salary** he kept only a few rupees for himself and the rest he devoted to public uses and particularly for helping poor students."

আচার্য রায়কে কেবল তাঁর ছাত্র ও বিদ্যার জগতের লোকই নয় সমাজের সাধারণ মানুষও তাঁকে কত শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চোখে দেখতেন তার পরিচয় পাব নিচের লেখা থেকে ঃ

"আচার্যদেবের বাহাত্তরতম জন্মোৎসব হলো ১১ ডিসেম্বর ১৯৩২ সালে। স্থান—কলকাতা টাউন হল। জয়ন্তী কমিটির সভাপতি ছিলেন ডাঃ নীলরতন সরকার, সভাপতির আসন গ্রহণ করলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাষণে বললেন ঃ

আমরা দুজনে সহযাত্রী। কালের তরীতে আমরা প্রায় একঘাটে এসে পৌঁছেছি। কর্মের ব্রতেও বিধাতা আমাদের কিছু মিল ঘটিয়েছেন।

আমি প্রফুল্লচন্দ্রকে তাঁর সেই আসনে অভিবাদন জানাই। যে আসনে প্রতিষ্ঠিত থেকে তিনি তার ছাত্রের চিত্তকে উদ্বোধিত করেছেন, কেবল মাত্র জ্ঞান দেননি, নিজেকে দিয়েছেন, যে দানের প্রভাবে সে নিজেকেই পেয়েছে।

বস্তু জগতে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে উদঘাটিত করেন বৈজ্ঞানিক। আচার্য প্রফুল্ল তার চেয়ে গভীরে প্রবেশ করেছেন। কত যুবকের মনোলোকে ব্যক্ত করেছেন তার গুহাহিত অনভিব্যক্ত দৃষ্টিশক্তি, বিচারশক্তি, বোধশক্তি। সংসারে জ্ঞানতপস্বী দুর্লভ নয়, কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে চরিত্রের ক্রিয়া প্রভাবে তাকে ক্রিয়াবান করতে পারেন অমন মনীষী সংসারে কদাচ দেখতে পাওয়া যায়।

আচার্য নিজের জয়কীর্তি স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে—পাথর দিয়ে নয়, প্রেম দিয়ে।

'আমরাও তার জয়ধ্বনি করি।'

এই জয়ন্তী উপলক্ষে চাঁদা উঠেছিল প্রায় সতেরো হাজার টাকা। আর খরচ হয়ে ছিল একশ সাতচল্লিশ টাকা।

চিঠির কাগজ, হ্যান্ডবিল, পোস্টার প্রভৃতির জন্য কাগজ বিক্রেতা কাগজ দিয়েছিলেন অমনি। ছাপাখানাও অমনি ছেপেছিল।

যাঁরা চাঁদা আদায় করতে বেরুতেন তাঁরা ট্রাম ভাড়া নিজেদের গাঁট থেকে দিতেন। বিশেষ কারণে মোটর দরকার হলে এক ভদ্রলোক পেট্রোল-সমেত তার গাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। হিসাব রক্ষক পয়সা নিতেন না। রোজ সন্ধ্যায় এসে খেটে দিয়ে যেতেন। অনুষ্ঠানের দিন মিউনিসিপ্যাল মার্কেটের ফুলওয়ালারা বিনা পয়সায় ফুল দিয়েছিল।

স্বেচ্ছাসেবকরা নিজ নিজ পয়সায় চা খেয়ে আসত। সেদিন ছুটাছুটি করবার জন্য চারখানি মোটরের যোগাড় হয়েছিল। দরওয়ানরা বকশিশ নিল না।

সরকার কান মলে স্ট্যাম্প ও টেলিগ্রামের খরচ নিল। করপোরেশন টাউন হল ভাড়া মকুব করতে পারল না। তাদের আইনে আটকায়। এই দুই বাবদ নগদ যে একশ সাতচল্লিশ টাকা খরচ হলো তা উদ্যোক্তাদের মধ্যে তিনজন দিয়ে দিলেন। বহু মনীষীর রচনায় সমৃদ্ধ এক স্মারক-গ্রন্থ আচার্যদেবকে উপহার দেওয়া হলো; তার প্রকাশের সমস্ত খরচ বহন করলেন একজন ধনী বিজ্ঞানী।

আদায়ী সতেরো হাজার টাকা পুরো মজুত রইল। তা বেড়ে আজ পঁচিশ হাজারে দাড়িয়েছে। কাগজ কিনে সরকারের হেফাজতে রাখা আছে। সুদ যা আসে দরিদ্র ছাত্রদের মাইনে দিতে বই কিনতে দেওয়া হয়।"

এই লেখা থেকে আচার্যদেবের প্রতি সমাজের ভালবাসার পরিচয় পাই। Manchester Guardian কাগজের এক প্রবন্ধে লেখা হয়েছিল—"যদি গান্ধী কোনও প্রকারে আর দুটি পি. সি. রায় সৃষ্টি করতে পারতেন তবে দেশ এক বছরেই স্বরাজ পেয়ে যেত।"

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে সোজাসুজি যোগ দেননি। কিন্তু বহুক্ষেত্রে এই দেশপ্রেমিককে রাজনৈতিক মঞ্চে ও টেনে নিয়ে যাওয়া হোত। তিনি রহস্য করে বলেছিলেন আমি দশমিনিটের

জন্য কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলাম। ১৯২৫ সালে মহম্মদ আলি প্রেসিডেন্ট হন। তিনি একদিন নমাজের সময় ডেলিগেটদের সম্মতি নিয়ে সাদরে অভ্যর্থনার মধ্যে প্রফুল্লচন্দ্রকে নিজ আসনে বসিয়ে যান কংগ্রেস মঞ্চে ।

১৯১৯ সালে রাউলাট আইনের (Rowlate Act) বিরুদ্ধে টাউন হলে যে সভা হয় চিত্তরঞ্জন দাস সেখানে প্রফুল্লচন্দ্রকে উপস্থিত থাকতে বলেন। আচার্যদেব দর্শক হিসাবেই যান। কিন্তু চিত্তরঞ্জন তাঁকে পাশে বসানোতে দশকবৃন্দ আচার্যদেবের কথা শোনবার জন্য তাঁকে যেভাবে সমাদর করে, কিছুক্ষণ তিনি কোনও কথাই বলতে পারেননি। অমৃত বাজার পত্রিকা লেখে ঃ

"So grave was the danger to our national life that even Dr. P.C. Roy left his work in the laboratory and joined the voice of protest against the obnoxious Bill." আচার্যদেব কংগ্রেসের সাথে যুক্ত হয়েও রাজনীতি ও দেশের মুক্তিযুদ্ধে কখনও সক্রিয় ভাবে নিজে যোগ দেননি। ছাত্রদের উৎসাহ দিয়েছেন, বিপ্লবী আন্দোলন যুক্ত ছাত্রদের নানা ভাবে সহযোগিতা করেছেন। শিক্ষা বিস্তার শিল্পের প্রসার ও লোকহিতের আবর্তে তা ব্যাহত হতে পারে—ইংরেজ নানা ভাবে এই কাজে বাধা সৃষ্টি করতে পারে—এই আশঙ্কাতেই তিনি সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেননি। অনেকেই আচার্যদেবকে মনে করত 'Staunch Revolutionary in the garb of a Scientist.' সরকারী খাতায় তার এই নাম ছিল কিন্তু সব সময় রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তাঁর আন্তরিক যোগাযোগ ছিল।

পৈত্রিক বাড়ির ভেতরের দিক।

১৯২৩ সালে ফরিদপুরে দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের এক বিরাট অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে সমাজ শাখার বিশেষ সম্মেলনে আচার্যদেব পৌরহিত্য করে ওজস্বিনী ভাষায় সমাজের অনুন্নত পিছিয়েপড়া শ্রেণীর পক্ষ গ্রহণ করে তদানীন্তন সমাজপতিদের ত্রুটি-বিচ্যুতির যে সমালোচনা করেন তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গান্ধীজীর হরিজন আন্দোলনের অনেক আগে থেকে আচার্যদেব সমাজে ছোঁয়াছুঁয়ি জাতপাত-এর ভেদাভেদের বিরুদ্ধে গ্রামেগঞ্জে প্রচার আরম্ভ করেছেন। এই বিষয়ে তার চিরন্তন উক্তি—"কুকুর বেড়াল আস্তাকুড় থেকে এসে ঘরের ভেতর প্রবেশ করলে আমাদের মনে কোনও নীচ ভাব জাগে না। তথাপি এই অনুন্নত শ্রেণীকে আমরা চিরদিনই অধম ও ঘৃণ্য মনে করে পদদলিত ও একঘরে রেখে সমাজকে সব দিক থেকে দুর্বল ও ঘুণ ধরাবার ব্যবস্থা করেছি।" ওই সভায় এই বার্তা ঘোষিত হয়। ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীরা এরই সুযোগ গ্রহণ করে আমাদের মধ্যে বিরাট বিভেদের সৃষ্টি করেছেন।

আচার্যদেব স্বদেশী আন্দোলনে চরকার গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছেন। যখন তিনি সঙ্কট ত্রাণ সমিতি গড়ে গ্রামে গ্রামে গেছেন তখন দেখেছেন গ্রামের মানুষের দুঃখ-দারিদ্র্য। বিলেতি সভ্যতা ও বিলেতী পণ্যের প্রসার যে পল্লীগ্রামের অন্নহীনতার কারণ এটা ছিল তার স্থির সিদ্ধান্ত এবং সেই জন্য চেয়েছিলেন বিলেতীপণ্য বর্জন, কুটির শিল্পের পত্তন। চরকার ও তাঁতের কাজের প্রসার ছিল পল্লীসমাজে তাঁর প্রচারের বাণী। তরুণদের অকারণে শহরমুখী না হওয়ার জন্য মফঃস্বলে শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যালয়-কলেজ প্রতিষ্ঠার তিনি ছিলেন পরম পক্ষপাতী।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সাথে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে যুক্ত করেছিলেন, স্বদেশী জিনিসের প্রতি তাঁর অত্যন্ত টান ছিল। তাঁর একান্ত উৎসাহে স্বদেশী কাপড়ের মিল, স্বদেশী ঔষধের ও প্রসাধন সামগ্রীর কারখানা, স্বদেশী চীনামাটির বাসনের কারখানা, স্বদেশী এনামেল বাসনের কারখানা গড়ে ওঠেছিল। তিনি নিজের হতে গড়ে তুলেছেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিকাল ওয়ার্কস লিমিটেড। গড়ে তুলেছিলেন বেঙ্গল পটারিজ কোঃ, বেঙ্গল এনামেল, Marine Co. ছাত্রদের দিয়ে কলেজস্ট্রীটে প্রকাশনা সংস্থা চক্রবর্তী ও চ্যাটার্জী আজও চলছে। আচার্যদেবের সহযোগিতায় গড়ে উঠেছে Bengal Insurance, Aryasthan Insurance Co.। তিনি দেখলেন সেই সময় এই Insurance-এর মাধ্যমে ইংরেজ প্রায় ৩০০ কোটি টাকা মুনাফা করছে এই ব্যবসায় ভারত থেকে। তাই তাদের এত আগ্রহ। আচার্যদেবের প্রেরণায় বাংলায় গড়ে উঠেছে আলামোহন দাসের লোহার কারখানা, Scale এবং Engineering শিল্প ও হাওড়ায় গড়ে উঠেছে।

আচার্যদেব তাঁর বন্ধু ডাঃ নীলরতন সরকারের সাহায্যে গড়ে তুলেছেন National Tannery Works, আচার্যদেবের প্রচেষ্টায় ভারতে গড়ে উঠেছে ১৯৩৮ সালে ভারতীয় Chemical Manufactures Association।

আজ ভাবা যায় না ইংরেজ আমলে কিভাবে এত কিছু দেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবাড়ির অনেকে, আচার্যদেবের বিখ্যাত সব ছাত্ররা এই স্বদেশী আন্দোলনে নিজেদের যুক্ত করেছেন।

আচার্যদেব গান্ধীজীর কংগ্রেসের গঠনমূলক আন্দোলনের সহায়ক ছিলেন কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন। তিনি তাঁর মতামত স্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন আলিগড়ের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation address-এ। তিনি বলেছেন, "We must not allow our loyalty to the mother country to be swamped by the wave of Extralerritorial patriotism. India must not be a spoke in the khilafat

wheel gyzated from **Istambul.** The Swaraj of India must he our one all compelling goal and everything else must he kept in its place." আচার্যদেব বলতেন, "Swadeshism is based upon pure love of one's country made product. I am Swadeshi and Swadeshi is my religion and it has been my life long aim to manufacture these articles which I have to import from foreign lands. Political Consideration does not sway one...Science can afford to wait but Swaraj cannot."

দুর্ভাগ্যক্রমে আজ যেমন স্বাধীন ভারতে মুসলিমদের শিক্ষা ও চাকরির জন্য সংরক্ষণের কথা চলছে, এমনি অবস্থা হয়েছিল ১৯৩৮ সালে। সেদিনও সারা যে ভারতে মুসলিম সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তাতে রবীন্দ্রনাথ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র ও শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী প্রমুখ নেতারা এই আন্দোলনে এগিয়ে এসেছিলেন।

নিজে তিনি চিরকুমার। কিন্তু তাঁর কাছে সব সময় থাকত বিভিন্ন জেলা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়তে আসা ছেলে। সব সময় আট দশটি ছেলে থাকত। তারা সব আচার্যদেবের কাছেই থাকত, তার ওখানেই খেত, আর বিজ্ঞান কলেজের বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাত। দিনের বেলায় কলেজের ঘরে ঘরে যার যার নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকত। মধ্যে মধ্যে আচার্যদেব প্রত্যেকর কাছে গিয়ে খোঁজ নিতেন কে কি কাজ করছে, কার কি অসুবিধা এই সব। হয়ত কোন যন্ত্রপাতির অভাবে কাজকর্মের অসুবিধা হচ্ছে, একবার কোনও মতে কথাটা তার কানে তুলতে পারলেই হলো। বাস, সেখান থেকে যদি সম্ভব না হয় নিজের পেনসনের টাকা থেকে নিজেই দিতেন সে সব কিনে। এইভাবে ছেলের দল কাজ করে যেত। তাদের কাজ থেকে যখন কোনও কিছুর ফল পাওয়া গেল তখন তাঁর কি আনন্দ, কি উল্লাস! যাকে পান তাকে ডেকে বলবেন—"দেখ, অমুক এই কাজটা করেছে, কি খেটেছে" ইত্যাদি।

আচার্যদেবের সংসারে যে ছেলেরা থাকত তাদের তিনি রীতিমত সংসারের কাজ করতে বাধ্য করতেন। কাউকে ঘর ঝাঁট দিতে হত, কেউ রান্না করতো, কেউ বা পরিবেশন করত। নিজে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নিজের কাপড় কাচতেন। নিজে মেলে দিতেন, আবার নিজেই সেটা যথা সময়ে গুছিয়ে তুলে রাখতেন। একটা কাজের লোক ছিল, সে রান্না করতো এবং সংসারের কাজকর্ম করত। মাঝে মাঝে তিনি তাকে গোপনে আগাম মাইনে দিয়ে ছুটি দিয়ে দিতেন। তখন সেখানে যারা থাকত, তাদেরকেই রান্না-বান্না করতে হত। এই ভাবে তিনি এম. এ, এম এস সি পাশ ছেলেদের সংসারের কাজ শেখাতেন। ঠিক যেমন করে ঘর-সংসারের বড়রা বয়স্কা মেয়েদের কাজ শেখান।

পল্লীদরদী, ছাত্রদরদী আচার্যদেব ১৯০০ সালে অর্থাৎ ৩৯ বৎসর বয়সে তাঁর সমস্ত অর্জিত ও ভবিষ্যতের সম্ভাব্য অর্জেয় সম্পত্তি ট্রাস্টিদের হাতে সমর্পণ করেন। এডুকেশন সোসাইটি নামে একটি প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার নিরক্ষরতা দূর করার প্রয়াস করেছিলেন। যখন খুলনায় যেতেন পল্লীর ও তন্নিকটবর্তী পাঠশালার শিক্ষকদের পড়ুয়াসহ আহ্বান করে দিনের পর দিন খাওয়ানর ব্যবস্থা করা ও শিক্ষকদের নতুন কাপড় ও অর্থ দিয়ে তাদের উৎসাহিত করা তাঁর এক বিশেষ আনন্দকর আয়োজন ছিল। গ্রামবাসীরা এই দিনগুলির অপেক্ষায় থাকত।

আচার্য রায়ের গ্রামে রাড়ুলিতে (বর্তমান বাংলাদেশে) প্রায় ৫০ বিঘার ওপর কপোতাক্ষের তীরে একটি বিরাট স্কুল নির্মাণ করান। আচার্যদেবের ইচ্ছা ছিল এখানে একটি কৃষি বিদ্যালয় গড়ে তোলা, আচার্যদেবের দান ও প্রচেষ্টা সত্ত্বেও সেই ইচ্ছা পূরণ হয়নি।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র বাংলা তথা ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবার জন্য আহ্বান পান। অনেকের কাছে প্রশ্ন শোনা যায়, তিনি কখনও কারাবরণ করেননি তবুও এটা সম্ভব হলো কি করে? এর কারণ প্রধানত চিরদিন তাঁর কর্মপন্থা ছিল গঠনমূলক। তিনি কখনও ভগ্ন রাজনীতির বশবর্তী ছিলেন না। সরকারী খাতায় তাঁর নাম ছিল, 'revolutionary is the garb of a scientist" কারণ তাঁর আশ্রয়ে বহু বিপ্লবী পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে বহুদিন কাটিয়ে গেছে।

১৯৩৪ সালে শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্যদেব দিল্লীতে জি. ডি. বিড়লার বাড়ীতে পাঁচ ছ দিন অবস্থান করেন। এ অবস্থান-প্রস্তাব ছিল তাঁর নিজবুদ্ধি প্রণোদিত। কারণ তিনি জানতেন যে বিড়লা প্রভৃতি অবাঙ্গালীদের নিয়ে বাংলার শোষণনীতি সম্বন্ধে বিভিন্ন বক্তৃতা ও প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন, তার ভুল ব্যাখ্যা হয়েছে। তিনি বাঙ্গালীকে 'মাড়োয়ারী প্রভৃতি অবাঙ্গালীদের মতো কর্মনিষ্ঠায় দীক্ষিত করতে চেয়েছিলেন। অবাঙ্গালীদের উপর কোনও বিদ্বেষ প্রচার তার উদ্দেশ্য ছিল না। এইসব কথা তিনি ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে নানা ভাবে বুঝিয়ে দিতে সফলকাম হয়েছিলেন। এটা তার বিশেষ দূরদৃষ্টির পরিচয় বলা যায়। এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করবার ইচ্ছাই যে তাঁকে বিড়লা ভবনে বাস করতে প্রলুব্ধ করেছিল। দিল্লীর প্রবাসী বাঙ্গালীদের জাতিগত দোষ 'দলাদলি' ত্যাগ করে চলতে উপদেশ দেন।

'খদ্দর পরিহিত সন্ন্যাসী' বৈজ্ঞানিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ১৫০ তম জন্মবর্ষে সারা দেশ ও সমাজে এই মহাপুরুষের জীবন ও বাণী প্রচারিত হোক।

সূত্র ঃ

১. Acharya Prafulla Chandra Ray–Birth Centenary Souvenir। C.V. 1962

২. আত্মচরিত—আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়—শৈব্য প্রকাশন

৩. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র—নীলিমা ঘোষ

৪. আচার্য স্মরণে—সুনীত কুমার ঘোষ

৫. আচার্য স্মরণে—নিমাই দাস রায়চৌধুরী

‘একাধারে বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোগী ও সমাজ-সংস্কারক’

সৃষ্টি বর্তমানে ধারে না কাটলেও ভারে কাটে। সৃষ্টির নাম ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড’। কেন্দ্রীয় সরকারি অধিগ্রহণের পর ১৯৮১ সালে যার নাম হয় ‘বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড’। আদতে যার স্রষ্টা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। আচার্যের অনুল্লিখিত জীবন-দর্শন আর শিল্প-ভাবনা নিয়ে ‘স্বস্তিকা’র প্রতিনিধি অর্ণব নাগ-এর সঙ্গে খোলামেলা আলোচনায় সেই অনন্য সৃষ্টির বর্তমান ম্যানেজিং ডিরেক্টর সুপ্রকাশ কুণ্ডু।

❑ মাত্র ৭০০ টাকা পুঁজির বিনিময়ে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ‘বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড’ চালু করেছিলেন। বর্তমান বাজারদর অনুযায়ী, যদি ধরে নিই সবকিছুরই দাম ১০০০ গুণ করে বেড়েছে তাহলে এই সময়ে সেই পুঁজির পরিমাণ দাঁড়াবে সাতশো ইনটু হাজার ইজুকল্টু সাত লক্ষ টাকা। কিন্তু এই মুহূর্তে আপনাদের পুঁজির পরিমাণ ঠিক কত?

● বেঙ্গল কেমিক্যালসের পুঁজি বলতে গেলে ‘ইক্যুইটি’-কে ধরতে হবে। আমাদের ‘ইক্যুইটি’ বর্তমানে ৮০ কোটি টাকার মতো। আপনারা জানেন, আমাদের পুরো কোম্পানীটাই কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অধিগৃহীত।

❑ বেঙ্গল কেমিক্যালসের সূচনালগ্নে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে বৃটিশ ফার্মাকোর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়েছিল। এখন আপনাদের লড়াইটা কাদের সঙ্গে?

● সেই বৃটিশদেরই সঙ্গে। বৃটিশ মানে বিভিন্ন বহুজাতিক সংস্থা। এর কারণও রয়েছে। ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীগুলোর কথা আলাদা, কিন্তু আমরা যারা সরকারি ব্যবস্থাপনায় রয়েছি; তাদের জন্যে সরকার নির্ধারণ করেছেন যে আমাদের উৎপাদনগুলোকে একটা ‘আতিথেয়তামূলক বাধ্যবাধকতা’র মধ্য দিয়ে বিক্রয় করতে হবে। এক্ষেত্রে উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করেন সরকার স্বয়ং। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘ন্যাশানাল প্রাইসিং অথরিটি’ দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করেন। আমাদের কোম্পানী দীর্ঘদিন রুগ্ন থাকার কারণে, অন্যান্য ক্ষেত্রে যা হয় যেমন বিভিন্ন ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানীর মেডিক্যাল বা সেলস প্রতিনিধি থাকে, আমরা তেমনটা করতে পারছি না। আমাদের তাই পুরোপুরি সরকারী সমীক্ষার ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। সরকারী সংস্থা হওয়ার দরুণ বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যের উর্দ্ধসীমা আমাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। অথচ সমমানের দ্রব্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি বহুজাতিক সংস্থা বা কোনও ব্যক্তিগত মালিকানাধীন সংস্থার যা খরচ পড়ে আমাদেরও কিন্তু সেই একই খরচ পড়ছে।

কিন্তু তারা দাম বাড়াতে পারলেও আমরা বিক্রয়মূল্য বাড়াতে পারছি না। সুতরাং লাভের অঙ্কটা দৃশ্যতই আমাদের ক্ষেত্রে শূন্য, কখনও কখনও লোকসানও সইতে হয়। এই কারণে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার উভয়েই ক্ষতির মুখে পড়ছে। এছাড়া দীর্ঘকালীন রুগ্ন শিল্পের একটা ব্যাপার তো আছেই। এখন সেটার থেকে বেরিয়ে আসারই চেষ্টা চালাচ্ছি আমরা।

❑ আপনি কি এটাই বলতে চাইছেন যে সরকারের ফাঁসটা 'বেঙ্গল কেমিক্যালসে'র গলায় বেশ চেপে বসেছে?

● না, তা নয়। সরকারবাহাদুর এখন আগের চাইতে অনেক খোলামেলা। সরকার এখন স্বয়ং আমাদের নিজেদেরকেই বাজার ধরতে উৎসাহিত করছেন।

❑ বেঙ্গল কেমিক্যালসের একেবারে প্রথম দিকের কিছু উৎপাদন যেমন অগ্নি নির্বাপক, সার্জারী এবং হাসপাতালের যন্ত্রাদি, ট্যালকম পাউডার, মাজন, গ্লিসারিন সাবান, কার্বোলিক সাবান ইত্যাদি থেকে আপনারা বহুদিন আগেই সরে গেলেন কেন? বাজারের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারলেন না বলে না কি সেই সময়ে ওই দ্রব্যগুলোর চাহিদা-ই ছিল না?

● আসলে ব্যাপারটা হয়েছিল কি, আমাদের একেবারে প্রথমের দিকে দেড়শো প্রকারের দ্রব্য উৎপাদিত হোত। তখন তো এত প্রতিযোগিতা ছিল না, বেঙ্গল কেমিক্যালসই এ টু জেড বানাত। এটা অস্বীকার করব না যে পরবর্তীকালে এই প্রতিযোগিতার বাজারেই আমরা কিছুটা পেছিয়ে পড়লাম।

❑ বর্তমানে কোন কোন 'প্রোডাক্ট'-এর ওপর আপনারা 'ফোকাস' করছেন?

● এখন মূলতঃ তিনটি বিষয়ে আমরা প্রাথমিক গুরুত্ব দিচ্ছি, প্রথমত কেমিক্যাল, যেটাকে আমরা বলছি ডিভিশন-চ। সেক্ষেত্রে ব্লিচিং পাউডার, ফটকিরি এই দু'টো জিনিসের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। জনস্বাস্থ্যের জন্য যেটুকু সাপ্লাই হচ্ছে তাতে ধরুন আমাদের উৎপাদিত এই ফটকিরির পুরোটাই কাজে লাগছে। এই ফটকিরিটা কিন্তু আই এস আই প্রোডাক্ট। আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো ভ্রাতৃসম কোম্পানীগুলোর সঙ্গেই আমাদের নিরন্তর সংঘর্ষ করতে হচ্ছে। ওই কোম্পানীগুলোর উৎপাদিত দ্রব্য অনেক সময়েই আই এস আই মার্কা হয় না। সরকারি টেন্ডার হলো প্রতিযোগিতা-ভিত্তিক। অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যালসও সেখানে যেমন এ-ওয়ান গ্রেড নিয়ে নেমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে আবার যে পেন্টাসিড দিয়ে জিনিস তৈরি করছে তারাও তেমনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে সেখানে। কিন্তু বেঙ্গল কেমিক্যালসের তুলনায় তার উৎপাদিত দ্রব্যের দাম নিশ্চিতভাবে ২০ শতাংশ কম হবেই। এখানে দামটাই বিচার্য, গুণমান নয়। সেক্ষেত্রে তো আমরা পিছিয়ে পড়বই। তবে যারা এই ব্যাপারটা জানেন, আমাদের ওপর তাঁদের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। সেই কারণে যতগুলো জন-স্বাস্থ্য কেন্দ্র রয়েছে, এছাড়া এন টি পি সি, স্টীল অথরিটি-র মতো সংস্থাও আমাদের কাছ থেকেই কিন্তু জিনিস কিনছেন এখনও।

❑ অর্থাৎ বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের 'ব্রান্ড ভ্যালু' নিয়ে আপনি পুরোপুরি নিঃসন্দিহান?

● একেবারে। আমি একটা বিষয়ে খুব গর্ব করি। দেখুন, ব্যবসা করতে গেলে অনেকগুলো জিনিসের সঙ্গে 'কম্প্রোমাইস' করতেই হয়। প্রতিযোগিতা আছে জেনেও আমরা আমাদের উৎপাদিত দ্রব্যের সঙ্গে কোনওরকম সমঝোতা করিনি। এমনকী জিনিসের ন্যূনতম দাম নিয়েও কখনও সমঝোতা করিনি। সেই কারণে কোথাও লাভ করতে পেরেছি, কোথাও পারিনি। কিন্তু জিনিসের গুণগত মানের উৎকর্ষতা নিয়ে আমরা কোনওদিন আপোস করিনি, করবও না। শুনলে অবাক হবেন, গতবছরে মান খারাপ হচ্ছে বলে তিনমাস উৎপাদন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল। অবস্থা দেখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় আর রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হলেন, শেষে জিনিসের গুণগতমান বাড়িয়ে আবার উৎপাদন চালু করেছিলাম।

❑ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় সারাজীবন চেয়েছিলেন দেশীয় শিল্পের বিকাশ হোক। আজ তারই কীর্তি 'বেঙ্গল কেমিক্যালস'কে যখন বহুজাতিক সংস্থার পাশাপাশি দেশীয় শিল্প সংস্থার সঙ্গেও প্রতিযোগিতায় নামতে হয় তখন কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে আপনার অনুভূতিটা ঠিক কিরকম? দুঃখ হয়, নাকি তার সঙ্গে একটা আনন্দের আবেশও থাকে?

● দেখুন আজকে বেঙ্গল কেমিক্যালসকে দেখেই হোক বা নাই হোক অন্যান্য শিল্প সংস্থা সবাই কিন্তু এস এস আই থেকে নিজেদেরটা গুছিয়ে নিতে পেরেছে। আজ তারা সবাই স্বাধীন। সত্যি বলছি, এটা দেখে আমার খুব ভাল লাগে। বেঙ্গল কেমিক্যাল তো তখন একা ছিল, আজ অনেকে এসে গেছে। এতে কিন্তু বাংলার সমাজই লাভবান হয়েছে। এতে দুঃখের কোনও স্থান নেই। আচার্য রায় বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে স্বদেশী শিল্পের প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। আজ তিনি থাকলে, স্বদেশী শিল্পের এই প্রসার তাঁকে নিশ্চয়ই খুশী করত। এতে আমরাও যে ধাক্কা খাইনি তা নয়, ধাক্কা খেয়েছি। কিন্তু ধাক্কা খেয়েও বসে যায়নি। অনেক কোম্পানী আছে যারা প্রোডাক্টের গুণমান ঠিক রাখতে পারেনি, তারা বন্ধ হয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে।

❑ এর পেছনে আচার্যের 'হিন্দু কেমিস্ট্রি'র অবদান কতটা?

● আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, এখনকার প্রতিযোগিতার বাজারে টিকে থাকতে গেলে ব্যবসায়ীকরণ অনিবার্য। এর ফলে সামাজিক চিন্তা-ভাবনা কিছুটা ব্যাহত হয়। আমরা এখন যে পথে যাচ্ছি সেটা পুরোপুরি ব্যবসায়িক। তবু বলব, ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রে আয়ুর্বেদের ভূমিকা তো অপরিসীম। তাই গাছ-গাছড়া দিয়ে রোগ সারানোর কৌশল এদেশে বহু যুগ আগে থেকেই চলে আসছে। আমি খুব গর্ব করে বলতে পারি এজাতীয় পেটেন্ট কেবল আমাদেরই আছে। সুতরাং অন্যভাবে হলেও এই সাফল্যে সেই অর্থে 'হিন্দু কেমিস্ট্রি'র অবদান কিছুটা হলেও থাকছে।

❑ নবজাগরণের ব্রাহ্মমুহূর্তে সূচনা হয়েছিল বেঙ্গল কেমিক্যালের। তারপর একটি শতক অতিক্রান্ত হওয়ার পর আরও এক দশক কেটে গেছে। এখনকার প্রেক্ষাপটে এই সুদীর্ঘ সময়ে বেঙ্গল কেমিক্যালসের সামাজিক ভূমিকা পালনে কতটা অদল-বদল হয়েছে?

● বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে প্রথম স্বদেশী শিল্প-প্রতিষ্ঠান হিসেবে একটা সামাজিক দায়িত্ব বেঙ্গল কেমিক্যাল সেই সময় অবশ্যই

১৯২৪ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্ — (দাঁড়িয়ে বাঁদিক থেকে) রায়বাহাদুর হরিধন দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও রাজশেখর বসু। (বসে বাঁদিক থেকে) ডব্লিউ এম রায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু ও রায়সাহেব কুঞ্জবিহারী বসু।

পালন করেছিল। এখন কাঁকুড়গাছিতে বাইপাসের ধারে আমাদের যে প্রতিষ্ঠানটি আছে, এলাকার উন্নয়নে সেটার কিছুটা অবদান থাকলেও আমাদের সবচেয়ে বড় সামাজিক-দান পানিহাটির কারখানাটি। বেঙ্গল কেমিক্যাল যখন সেখানে কারখানা চালু করেছিল তখন তো জায়গাটা এত উন্নত ছিল না। ওখানকার রাস্তা বলুন, বা আশেপাশের এলাকার উন্নয়ন, পুরো গঙ্গার ধার পর্যন্ত; আমাদের কারখানা এর পেছনে না থাকলে তা করা সম্ভব হোত না। সবচেয়ে দুঃখের কথা কি জানেন এই কারখানাটি দীর্ঘকালীন রুগ্নতায় ভুগছে। ১৯৮০-তেই কোম্পানীটি রুগ্ন বলে ঘোষিত হয়েছিল। সরকার এর অধিগ্রহণ করেন ১৯৮১-তে। জাতীয়করণ হওয়া ইস্তক আজ ২০১০ পর্যন্ত এটা একটা রুগ্ন কোম্পানী, বি আই এফ আর-এর কোম্পানী। আগে ভালভাবে মাথা তুলে আমাদের দাঁড়াতে হবে, তারপর সামাজিক ভূমিকা নিয়ে ভাবা যাবে। ৩০ বছর ঘাটতিতে চলেও, যে কোম্পানী আজ দাঁড়িয়ে আছে, এটাই আপাতত অনেক। আসলে এই মুহূর্তে সামাজিক ভূমিকা পালনের কোনও ক্ষমতা আমাদের নেই।

❑ এই দাঁড়িয়ে থাকার কৃতিত্বটা কাকে দেবেন?

● অবশ্যই বেঙ্গল কেমিক্যালকে। তাদের 'ব্র্যান্ড নেম', তাদের লোকজন সবাইকে। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানকেও এর সঙ্গে যুক্ত করুন। তবে সবচেয়ে বেশি কৃতিত্ব কাকে দেব জানেন? আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে। আজও পর্যন্ত যদি একটা প্রকল্পও অনুমোদিত হয় তবে তাঁর নামেই সেটা হয়।

❑ মানে ১৯৪৪ সালের ১৬ই জুন আচার্যের মৃত্যুর ৩৭ বছর পরেও তিনি আপনাদের সঙ্গে ছিলেন, আজও আছেন। এটাই কি বলতে চাইছেন?

● অবশ্যই, বাংলার লোকেরা আচার্যের নামের প্রতি এতটাই দুর্বল যে সেটা দিল্লী পর্যন্ত সঞ্চারিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারও আমাদের 'ব্র্যান্ড ভ্যালু' দেখে আর আচার্যের নামেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

❑ বাঙালীর কথাই যখন বললেন তখন এটা কি আপনার মনে হয় না যে আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর 'অব্যক্ত' যেভাবে বঙ্গদেশে ব্যক্ত হয়েছে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের 'হিন্দু কেমিস্ট্রি' সেভাবে পারেনি?

● কথাটা হয়তো ঠিক। তবে এটাও সত্যি যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিনে প্রতি বছরই আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে তাঁকে স্মরণ করি। তাঁর সার্ধশতবর্ষে এবার অনেক বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছে। আপনারাও ('স্বস্তিকা' ও অন্যান্য সংবাদমাধ্যম) এগিয়ে এসেছেন। এবছর তাঁর স্মারক বক্তৃতায় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান আসতে পারেন। এছাড়া ২ আগস্টের পরে টাউন হলে একটি আলোচনা চক্রের কথা ভাবা হচ্ছে। সেখানে প্রধানমন্ত্রী বা ওরকম কেউ আসতে পারেন। ওনার কাজ ও জীবন নিয়ে একটা 'ডি ভি ডি' তৈরিরও চেষ্টা চলছে। আমাদের চারটে শাখায় (মুম্বাই, কানপুর, পানিহাটি, কাঁকুড়গাছি) আলাদা আলাদাভাবে রক্তদান শিবির, পূর্বে অনুষ্ঠিত ছবি আঁকো প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে প্রতিবারের মতো এবারও যথারীতি আচার্যকে স্মরণ করা হবে। পানিহাটির যে বাংলোতে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ছিলেন বর্তমানে তার জরাজীর্ণ অবস্থা। সেটাকে আমি নতুন করে সংস্কার করে হেরিটেজ কমিশনের কাছে 'ঐতিহ্যবাহী ভবন' হিসেবে তা বিবেচনা করার জন্য আবেদন করবো। ২০১০-এর ২ আগস্টেই ওটা কাউকে দিয়ে উদ্বোধন করানোর ব্যাপারে প্রথমে ভেবেছিলাম;কিন্তু কিছু অনিবার্য কারণবশত, যেহেতু আগামী একবছর ধরেই আমাদের বিভিন্ন কার্যক্রম চলবে, তাই অন্য কোনও দিন ওর উদ্বোধন হবে।

❑ অর্থাৎ আচার্যকে 'বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড' আজও মনে রেখেছে?

● বেঙ্গল কেমিক্যালস তাঁকে কখনও ভোলেনি, ভবিষ্যতে কোনওদিন ভুলবেও না।

❑ আপনার কথায় ভারতের জাতীয়তাবাদী মানুষ নিঃসন্দেহে নিশ্চিত হবেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে তাঁর শিল্পভাবনাকে আপনি কি চোখে দেখেন?

● তাঁর শিল্পভাবনা-কে আমি দেখি Entreprenuership হিসেবে। ১৯০১ সালে ৯১, আপার সার্কুলার রোডে একটা ভাড়াবাড়িতে তিনি যে কর্মযজ্ঞের সূচনা করেছিলেন মাত্র একটি পরীক্ষাগার তৈরি করে, শতবর্ষ পার করেও তার উপস্থিতি অম্লান বিশ্ববাসীর কাছে। সেই পরীক্ষাগারে তিনি কিছু জিনিস তৈরি করলেন, শুধু তৈরি করেই ক্ষান্ত হলেন না; তারপরে খবরের কাগজে তার বিজ্ঞাপনও দিয়েছিলেন। কিভাবে 'প্রোডাক্ট প্রমোশন' তিনি করেছিলেন ভাবুন একবার। তিনি প্রথমে কুইনাইন তৈরি করলেন, তারপর

স্টেটসম্যানের মতো তখনকার বৃটিশদের পক্ষাবলম্বী কাগজে তার বিজ্ঞাপনও দিলেন। ওই যুগে তাঁর চিন্তাভাবনা এমনই পেশাদার ছিল যে তিনি বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লোকেদের বললেন—দু'টি জিনিসের ওপর নজর দাও। প্রথমত, কোয়ালিটি;দ্বিতীয়ত, দাম। ওর দাম তখন বোধহয় ছ' আনা হবে। মার্কেটিং-টা কিন্তু উনি আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। যা আজকের টিভি, কম্পিউটার, ইন্টারনেট ইত্যাদির যুগেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। একটা কথা মাথায় রাখতে হবে। তিনি বৃটিশ ফার্মাকোর বিরুদ্ধে লড়ে স্বদেশী শিল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তাই দাম আর গুণমান দু'টো ব্যাপারেই তাঁকে খেয়াল রাখতে হয়েছিল, সঙ্গে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সাধারণ লোককে অবগত করার কাজটাও তাঁকে বেশ গুরুত্বের সঙ্গেই করতে হয়েছিল। তবেই না স্বদেশী শিল্প এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল! আরও একটা ব্যাপার কি জানেন, উনি তো মুড়ি খাবার টাকাটুকু রেখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওনার যাবতীয় উপার্জন সবই দান করেছিলেন। তাই বেঙ্গল কেমিক্যালের জন্য তাঁর ফাইনান্সারের যথেষ্ট প্রয়োজন ছিল। তিনি ওষুধ তৈরিতে মন দিয়েছিলেন যাতে করে মানুষের সেবা করা যায়। এসব দেখেই না বিনিয়োগকারীরা এগিয়ে এসেছিলেন।

❑ আচার্য চেয়েছিলেন বাঙালী শিল্প গড়ুক, ব্যবসায় নামুক। আজকের পরিস্থিতিটা কি আপনাকে হতাশ করে?

● না, তা কেন? বাঙালী সেভাবে না হলেও তো কিছু শিল্প গড়ছে এখন। প্রসূন মুখার্জীর মতো বাঙালী আজ সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি, কয়েকশো কোটি টাকার মালিক। শুধু ভারতেই বা কেন, তিনি ইন্দোনেশিয়াতেও তো চুটিয়ে ব্যবসা করছেন। তিনি বাংলাতেও নয়াচরে এসেছিলেন শিল্প গড়তে কিন্তু বাধা পেলেন, চলে গেলেন গুজরাটে। আসলে বাঙালী কিছু করছে না তা নয়, কিন্তু বাঙালী ঝুঁকি নিতে জানে না। নইলে দেখুন একমাত্র টাটা বাদে; খৈতান, বিড়লা, গোয়েঙ্কা সবার 'বেস' তো বাংলাতেই। আসলে আমরা নিজেরাই নিজেদের জায়গাটাকে নষ্ট করেছি। নইলে আজ বাংলা ছেড়ে সবাই গুজরাট, মহারাষ্ট্র, এমনকী শিলবাসা এসব জায়গায় ছুটছে কেন? এটা ভাবা দরকার।

❑ প্রফুল্লচন্দ্র রায় সম্ভবত এই বিষয়টার দিকেই একবার নির্দেশ করে বলেছিলেন—'আমি শিল্পে অগ্রগতির জন্য মাড়োয়ারীদের বিরুদ্ধে কিছু বলছি না, আমার ক্ষোভ বাঙালীদের বিরুদ্ধে। তারা কেন শিল্পবিমুখ হবে?' আপনিও কি এটাই বলবেন বর্তমান প্রেক্ষিতে?

● অবশ্যই বলবো। আমি কিন্তু তাদের ঘৃণা করছি না। বরং ভারতীয় হিসেবে গর্বিতই হচ্ছি। আজ গুজরাটী, আম্বানীরা যেখানে চলে গেছে তাতে দেশের সম্মানই বেড়েছে। আজ বাঙালীরা যথেষ্ট উচ্চশিক্ষিত, কিন্তু তারা কেউ বাংলায় থাকছে না। তারা 'শিক্ষা'টাকে ভাঙাতে চাইছে। তা করুক, আপত্তি নেই। কিন্তু ঘরকুনো বদনাম কিছুটা ঘুচলেও, ব্যবসাবিমুখ বদনাম বাঙালীর ঘোচেনি।

❑ বাঙালীর অতিরিক্ত রাজনীতি বিলাসকেই কি এর জন্য দায়ী করতে চাইবেন?

● রাজনীতি সামগ্রিকভাবে একটা ক্ষতি তো করেছেই। তার ওপর আমরা একটা পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছি। তার প্রভাব তো কিছুটা পড়বেই। এই যে আমাদের মন্ত্রী আর আমলারা দিল্লী গিয়ে এমনসব সার্কাসীয় মন্তব্য করে দেন মাঝেমধ্যে তাতে আমাদেরকেই লজ্জায় পড়তে হয়। এই কোম্পানীও তার ব্যতিক্রম নয়।

❑ বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় 'বেঙ্গল কেমিক্যালে'র সূচনালগ্নে জাতীয় রাজনীতি একে কতটা গৌরবান্বিত করেছিল তা আমরা জানি। আপনার কাছে জানতে চাইব বিংশ শতাব্দীর শেষে দলীয় রাজনীতি এই কোম্পানীকে কতটা ক্ষতিগ্রস্ত করেছে?

● ঠিকই। তখন রাজনীতিটা ছিল দেশকে স্বাধীন করবার জন্য, আর এখন রাজনীতি হয়েছে দলের ও নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করবার জন্য। এখনকার রাজনীতির আসলে অপপ্রয়োগ হচ্ছে। এতে আমাদের কোম্পানীর যা ক্ষতি হয়েছে, তার পরিমাণ নির্ধারণ করা সাধ্যাতীত।

❑ প্রফুল্লচন্দ্র রায়কেও একদিন এই 'বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড' ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল কেন?

● এখানেও সেই রাজনীতি। প্রফুল্লচন্দ্র রায় চেয়েছিলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল শিল্পোদ্যোগী হোক, কাজকর্ম করুক, উন্নতি করুক, নতুন দ্রব্য আবিষ্কার করুক, মানুষের সেবা করুক। কিন্তু কোম্পানীর বিনিয়োগকারী এবং প্রোমোটাররা চাইতেন স্রেফ তাদের পুরো বিনিয়োগের ওপর লাভের অঙ্কটা গুছিয়ে নিতে। এই নিয়েই তাঁর সাথে ওদের বিরোধ লাগল। আচার্য বলতেন, তুমি লাভ করবে ঠিকই কিন্তু সেই লভ্যাংশ থেকে কিছু টাকা কোম্পানীর বিস্তারের জন্য ব্যয় করবে। তবেই না কোম্পানী বাড়বে। আসলে তিনি তো বিজ্ঞানী ছিলেন। মানুষের কল্যাণে তাই বিজ্ঞানের গবেষণাটাকে কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। প্রোমোটাররা এটা চায়নি। তাদের সাথে এই নিয়ে বিরোধেই তাঁকে কোম্পানী ছাড়তে হলো। দুঃখের কথা, তখন বেঙ্গল কেমিক্যালের ম্যানেজমেন্টের লোকেরা সব বাঙালীই ছিলেন। অনেক চেষ্টা করেও তাঁকে এখানে আর ফেরানো যায়নি। এরপর তিনি আর বেশিদিন বাঁচেনওনি।

❑ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে আজকের বাঙালী কেন মনে রাখবে? একজন বিজ্ঞানী হিসেবে নাকি একজন শিল্পোদোগী হিসেবে নাকি একজন সমাজ-সংস্কারক হিসেবে? আপনি কি মনে করেন?

● এই তিনটে কারণের জন্যই আপামর বাঙালী তাঁকে মনে রাখবে। তিনি একাধারে বিজ্ঞানী, শিল্পোদ্যোগী আর সমাজ-সংস্কারকের সুষ্ঠু মিশেল। এটাই তাঁর বিশেষত্ব।

(সুপ্রকাশ কুণ্ডুর ছবি তুলেছেন শিবু ঘোষ)

পরাধীন ভারতে নব্য-রসায়ন শিল্পের পথিকৃৎ

ডঃ নিতাইচন্দ্র মণ্ডল

সভ্যতার শুরু থেকে মানুষ প্রয়োজনের তাগিদে দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক রসায়নশিল্প সৃষ্টি করেছে, বিজ্ঞানের তত্ত্ব না জেনেই। পরবর্তীকালে মৌলিক গবেষণার উন্নতির সঙ্গে শিল্পেরও উন্নতিসাধন হয়েছে। আবার উন্নত শিল্প উন্নত মানের রসদ ও যন্ত্রপাতি যোগানের দ্বারা বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণাকে উন্নত করতে সাহায্য করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ভারতে কিছু কিছু ছোটখাটো রাসায়নিক শিল্প গড়ে উঠলেও তা স্থায়ী হয়নি, সম্ভবত বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে সেগুলির মান সময়ের সঙ্গে চাহিদা অনুযায়ী উন্নত করা হয়নি বলে। ১৮৮০-র দশকে বিলেতে ছাত্রাবস্থায় প্রফুল্লচন্দ্র এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় কেমিক্যাল সোসাইটির সহ-সভাপতি হিসাবে ওদেশের অনেক রাসায়নিক কারখানা ঘুরে দেখে শিল্পের ব্যাপারে কিছু প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, বিজ্ঞান ও শিল্প পরস্পর নির্ভরশীল। দেশে ফিরে আসবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বেকার যুবশক্তিকে শিল্পের কাজে লাগানোর অভিপ্রায়ে তিনি বাংলা দেশের নানা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে রাসায়নিক শিল্প গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। প্রথমে তিনি কলকাতার ঔষধ ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খোঁজখবর নেওয়ার পর যেসব রাসায়নিক দ্রব্যের ঔষধ হিসাবে বাজারে চাহিদা বেশি, আশেপাশের প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে সেইসব রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করবার পরিকল্পনা নিলেন। প্রথমে তিনি কুচো লোহার সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে হীরাকস প্রস্তুত করেছিলেন। এরপর তিনি বাজার থেকে লেবু কিনে এনে তা থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড এবং প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে পাওয়া সাজিমাটি থেকে সোডা তৈরির উদ্দেশ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেন। কিন্তু তিনি দেখলেন যে, বাজারে সাইট্রিক অ্যাসিড ও সোডার যা দাম সে তুলনায় তাঁর তৈরি ওই দ্রব্যগুলির দামের পড়তা বেশি পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং তিনি এ পরিকল্পনা পরিত্যাগ করলেন।

অধ্যাপক রায় থাকতেন মুসলিম-প্রধান রাজাবাজারের সন্নিকটে ৯১ নং আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতে। এখানকার কসাইখানায় প্রচুর পরিমাণে পরিত্যক্ত হাড় জমা হোত। প্রফুল্লচন্দ্র ওইসব বর্জ্য হাড় থেকে ক্যালসিয়াম ফসফেট ও সুপারফস্‌ফেট অব লাইম তৈরির পরিকল্পনা নিলেন। যেই ভাবা সেই কাজ। তিনি কম দামে ওইসব হাড় কিনে বাড়ির ছাদে শুকিয়ে নিয়ে সেগুলিকে পুড়িয়ে ভস্ম তৈরি করলেন। এই অস্থি ভস্মের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের

বিক্রিয়া ঘটিয়ে তিনি সুপারফস্‌ফেট অব লাইম প্রস্তুত করেছিলেন। তারপর তিনি বেশ কিছু রাসায়নিক দ্রব্যের প্রস্তুতি-সম্পর্কিত নানা রকম সমস্যা সমাধান করলেন এবং বাজার থেকে অপরিশোধিত যবক্ষার (নাইটার) সস্তায় কিনে এনে পরিশোধিত করে প্যাকেট করাও শুরু করলেন। তিনি বৃটিশ ফার্মাকোপিয়ার মান অনুযায়ী বেশ কিছু রাসায়নিক (ফেরাস সালফেট, সোডিয়াম ফসফেট) এবং ঔষধ (সিরাপ ফেরি আয়োডাইড, লিকার আর্সেনিক্যালিস, লিকার বিসমাথ ইত্যাদি) তৈরি করেছিলেন। এইসব দ্রব্যগুলি কম খরচে প্যাকিং করবার জন্য কাঁচ বিক্রেতার কাছ থেকে সস্তায় পুরানো কাঁচের বোতল কিনে এনে সেগুলি পরিষ্কার করে ব্যবহার করতেন। এতদিন ধরে ৯১নং আপার সার্কুলার রোডের ভাড়া বাড়িতেই ছোট কারখানা ও অফিস বানিয়ে উপরোক্ত রাসায়নিক দ্রব্যগুলি তৈরির দ্বারা রসায়নশিল্পের প্রাথমিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার পর প্রফুল্লচন্দ্র ১৮৯২ সালে একটি কোম্পানি গঠন করে রাসায়নিক কারখানা প্রতিষ্ঠিত করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। পরিকল্পিত রাসায়নিক এবং ভেষজ—উভয় রকমের পদার্থ তৈরির সম্ভাবনার কথা মনে রেখে তিনি প্রস্তাবিত কোম্পানির নাম দিলেন 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'। তখন থেকেই এই কোম্পানি বিরামহীন যাত্রা শুরু করল এবং সঙ্গে 'শিক্ষক' ও 'রসায়নবিদ' প্রফুল্লচন্দ্র 'শিল্পবিদ' আখ্যাও প্রাপ্ত হলেন।

এই সময় প্রফুল্লচন্দ্রের এধরনের একটি মহৎ প্রচেষ্টার কথা শুনে তাঁর এক পুরাতন সহপাঠী ডাঃ অমূল্যচরণ বসু সহযোগিতার মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেন। প্রফুল্লচন্দ্র নিজ সঞ্চি ত নামমাত্র আট শত টাকা মূলধন নিয়ে শুরু করেছিলেন। এই টাকার পরিমাণ অল্প হলেও তাঁর শিল্প গড়ে তোলার মানসিক দৃঢ়তা এবং ইচ্ছাশক্তি অনেক উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। অমূল্যচরণ তাঁকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করলেন। প্রফুল্লচন্দ্রের এক গ্রামবাসী যাদবচন্দ্র মিত্রের একটি সালফিউরিক অ্যাসিড কারখানা টালিগঞ্জের দক্ষিণে সোদপুর গ্রামে ছিল। যাদবচন্দ্রের অনুরোধে প্রফুল্লচন্দ্র ওই কারখানাটি কিনে নিলেন। এর প্রায় দশ বৎসর পরে প্রয়োজনীয় মূলধন যোগাড় করে তিনি চন্দ্রভূষণ ভাদুড়ী ও তাঁর ভাই কুলভূষণের পরমার্শ নিয়ে এটিকে উৎপাদনক্ষম একটি বৃহদাকার কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কারখানাতে পরিণত করলেন।

প্রফুল্লচন্দ্র একজন রসায়নবিদ আর বন্ধু ডাঃ অমূল্যচরণ একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার। এঁদের সম্মিলিত উদ্যোগে এই কোম্পানির অগ্রগতির পথ ক্রমে মসৃণ হতে শুরু করল। কোম্পানির তৈরি ঔষধ রোগীদের ব্যবস্থাপত্রে লেখার জন্য অমূল্যচরণ সমসাময়িক ডাক্তারদের প্রভাবিত করতে লাগলেন। এর ফলে রাধাগোবিন্দ কর, নীলরতন সরকার, লেঃ কর্ণেল সুরেশ সর্বাধিকারী প্রমুখ কয়েকজন নামকরা ডাক্তার রোগীর ব্যবস্থাপত্রে এই কোম্পানির তৈরি ঔষধ লিখতে শুরু করলেন। অমূল্যচরণ এতই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে, তিনি স্থানীয় কবিরাজদের কাছ থেকে বিভিন্ন আয়ুর্বেদিক ঔষধের ফর্মুলা জোগাড় করে এনে সেইসব ঔষধ তৈরি করতে শুরু করলেন। ইতিপূর্বে কুর্চির সার, সিরাপ বাসক, জোয়নের সার, কালমেঘের সার ইত্যাদি তৈরি হয়েছিল। এই পর্বে ১৮৯৮ খৃস্টাব্দে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় মেডিক্যাল কংগ্রেসে প্রফুল্লচন্দ্র একটি প্রদর্শনী স্টল খুলে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা ডাক্তারদের সাথে কথা বলে কোম্পানির তৈরি রাসায়নিক ও ভেষজ দ্রব্যের প্রতি তাঁদের আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এইভাবে তিনি ভারতের ভেষজ ও ওষুধের বাজারে প্রবেশ করবার পথ প্রশস্ত করলেন।

ইতিমধ্যে পর পর দু'টি অঘটন ঘটেছিল। অমূল্যচরণের ভগিনীপতি সতীশচন্দ্র সিংহ রসায়নশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করবার পর আইন পড়েছিলেন। কিন্তু তিনি অমূল্যচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই কোম্পানীতে কেমিস্ট হিসাবে যোগ দেন। তিনি খুব নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করতেন। কিন্তু একদিন তিনি হাইড্রোসায়ানিক অ্যাসিড নিয়ে কাজ করতে গিয়ে অসাবধানতাবশতঃ এই অ্যাসিডের বিষক্রিয়ায় মারা যান। এই অঘটনের কিছুদিন পরেই ১৮৯৮ সালের শেষের দিকে ডাঃ অমূল্যচরণ প্লেগ রোগীদের চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করতে গিয়ে নিজে এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। এক শোকাঘাতের তীব্রতা কমতে না কমতে প্রফুল্লচন্দ্র আর একটি শোকাঘাত পেলেন, যা সামলে উঠতে তাঁর বেশ কিছু দিন লেগেছিল।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল বেঙ্গল কেমিক্যাল একটি 'প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি'তে পরিবর্তিত হয় এবং ৯০নং মানিকতলা মেন রোডে বর্তমান অবস্থানের জায়গাতে স্থানান্তরিত হয়। এই লিমিটেড কোম্পানির প্রথম ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বোস। ১৯০৩ সালে প্রফুল্লচন্দ্রের ছাত্র রাজশেখর বসু (বাংলা সাহিত্যের পরশুরাম) কেমিস্ট হিসাবে যোগদান করলেন। এর কিছু দিন পরে তাঁর আর এক ছাত্র সতীশচন্দ্র দাশগুপ্তও যোগদান করেন। এঁদের সুষ্ঠু পরিচালনায় ধীরে ধীরে উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। অল্প সময়ের মধ্যেই এই কোম্পানির তৈরি ঔষধ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য বাজারে সুনাম অর্জন করতে শুরু করল। পরবর্তীকালে তাঁর আরও অনেক দায়িত্বশীল ছাত্রের সহযোগিতায় এই কোম্পানির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগল। বাজারে চাহিদা অনুযায়ী উৎপাদন বৃদ্ধি করবার জন্য প্রফুল্লচন্দ্র স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য পেয়েছিলেন। স্যার জন কিউমিং তাঁর 'রিভিউ অব দি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পজিশন অ্যাণ্ড প্রস্পেক্টস অব বেঙ্গল ইন ১৯০৮' বইয়ে এই কোম্পানির ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ১৯১২ সালে প্রফুল্লচন্দ্র সি. আই. ই. উপাধি এবং ১৯১৯ সালে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত হন।

১৯১৩ সালে প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পরিকল্পনায় অক্সিজেন যন্ত্র বানানো শুরু হয়। আরও যেসব যন্ত্রপাতি বানানো শুরু হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল রাসায়নিক তুলাযন্ত্র, গ্যাস বার্ণার, অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র (ফায়ার কিং) এবং হাসপাতালে ব্যবহারোপযোগী নানা ধরনের যন্ত্র ও সার্জিক্যাল ড্রেসিং। ফায়ার কিং যন্ত্রটি বিদেশ থেকে আমদানিকৃত যন্ত্র অপেক্ষা দামে কম অথচ কাজেও বেশি দক্ষ ছিল। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়োপযোগী বিভিন্ন দ্রব্যের চাহিদা মেটাতে কোম্পানির উৎপাদন

বিভিন্ন দিকে প্রসারিত করা হয়েছিল এবং উৎপাদনের পরিমাণও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরপর উৎপাদন সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ১৯২০ সালে কলকাতা থেকে ১২ মাইল উত্তরে বি টি রোডের ধারে পানিহাটিতে জায়গা ক্রয় করে ওখানে পরিকাঠামো গড়ে তুলবার পর ১৯২২ সালের শেষে আলকাতরার পাতন প্রক্রিয়া এবং ১৯২৪ সালে ফটকিরির বৃহদাকার উৎপাদন চালু হয়। ওই সময় খাওয়ার জল বিশুদ্ধিকরণে এবং বস্ত্র রাঙানোর কাজের জন্য ফটকিরির চাহিদা ছিল খুব বেশি। ১৯৩১ সালে এই কারখানায় একটি উন্নত মানের সালফিউরিক অ্যাসিড প্ল্যান্ট স্থাপিত হয়।

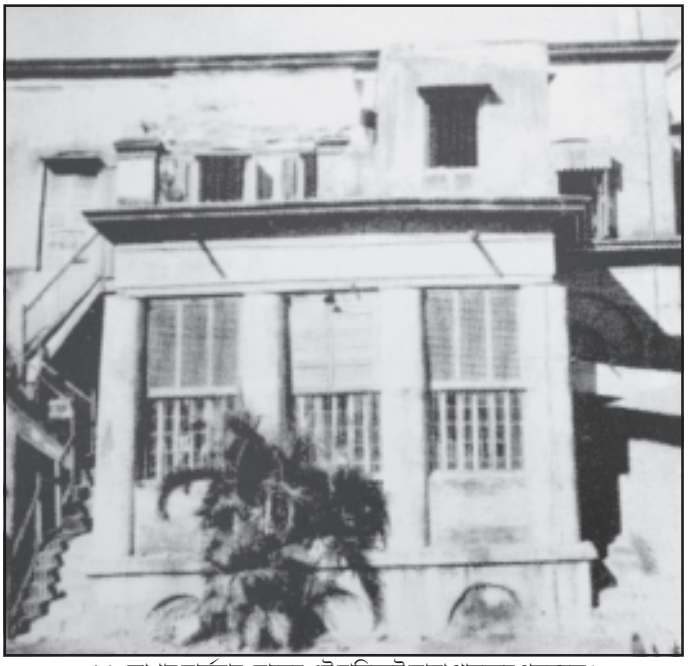

৯১, আপার সার্কুলার রোডের এই বাড়িতেই ভাড়া থাকতেন প্রফুল্লচন্দ্র।

যে কোনও প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানি বড় হওয়ার সঙ্গে তার পরিচালন সমিতি নানারূপ সমস্যার সম্মুখীন হতে শুরু করে। এই নব প্রতিষ্ঠিত কোম্পানিও তার ব্যতিক্রম ছিল না। লিমিটেড কোম্পানি হওয়ার পরে কোম্পানি যখন যৌবনে পদার্পণ করল, তখন শেয়ার-হোল্ডারদের মধ্যে ডিভিডেন্ট বন্টনের ব্যাপারে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। যদিও ১৯২৯ সালের পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীদের হিতার্থে নানা ধরনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছিল, তা সত্ত্বেও ১৯৩৫ সাল থেকে শুরু করে পর পর বিভিন্ন নামে কয়েকটি কর্মচারী ইউনিয়ন গঠিত হয়। পরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক দাবী-দাওয়াকে সামনে রেখে এইসব ইউনিয়ন ধর্মঘট শুরু করে। কিন্তু এতসব অশান্তির মধ্যেও বেঙ্গল কেমিক্যাল প্রাদেশিক গণ্ডীর বাইরে গিয়ে লাহোরে একটি এবং ১৯৩৬ সালে বোম্বাইয়ে (বর্তমানে মুম্বাই) ক্যাডেল রোডে একটি কারখানা স্থাপন করে সেখানে উৎপাদন শুরু করেছিল।

১৯২৯ সালে বেঙ্গল কেমিক্যালে প্রাণীজাত ঔষধ তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয় এবং ব্যাক্টেরিয়লজিস্ট হিসাবে ডঃ হীরেন্দ্রনাথ দত্তকে নিয়োগ করা হয়। তিনি প্রথমে প্রাণীর থাইরয়েড, পিট্যুইটারি, টেস্টিস ও ওভারি গ্রন্থি থেকে নির্যাস (হর্মোন) তৈরি এবং তারও এক বছর পরে ভিটামিন তৈরি শুরু করেন। এরপর তাঁর সহকারীরূপে ডঃ এ. কে. হাজরা যোগ দেন। তখন থেকে ভেষজ সিরাম, ভ্যাক্সিন, যকৃৎ নির্যাস, ইন্‌জেকশন দেওয়ার উপযোগী নির্বীজকৃত দ্রবণ তৈরি শুরু হয় এবং এগুলি জাতীয় স্তরে খুবই সুখ্যাতি অর্জন করে। এর পরে প্রাণীর উপরোক্ত গ্রন্থিগুলি শুকনো করে তা দিয়ে ট্যাবলেট তৈরি শুরু হয়। ১৯৩৪ সালে শুরু হয়েছিল উন্নতমানের প্রসাধনী সাবান, কাপড় কাচা সাবান, বীজাণুনিবারক তরল সাবান, ক্ষৌর কর্মে ব্যবহৃত সাবান, এবং ঔষধ-মিশ্রিত ও সুগন্ধ কেশ তৈল, মুখে মাখার পাউডার ও ট্যালকম্ পাউডার, ও সুগন্ধি দ্রব্য তৈরি। ১৯৩৪ সালে সতীশচন্দ্র সেন ও জগদীন্দ্রনাথ লাহিড়ী ইথাইল ইথার ও অবেদক ইথার তৈরি করেন। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের সময় এগুলির চাহিদা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তখনকার আধুনিক বিজ্ঞানের প্রয়োগ এবং গবেষণার মাধ্যমে উৎপাদনের মান উন্নত করবার জন্য একটি বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছিল। ১৯৩৪ সালে রাজশেখর বসুর উদ্যোগে 'প্রফুল্লচন্দ্র ভবন' নামাঙ্কিত একটি দোতলা বাড়ি নির্মিত হয়েছিল যেখানে শিল্প-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য 'স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রিসার্চ ল্যাবরেটরি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পরবর্তীতে। ১৯৩১ সালে জাতীয়স্তরে আরও শেয়ারহোল্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী, ডাক্তার, উচ্চপদস্থ সরকারি চাকুরে এবং বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ছিলেন।

শিল্প শুরু করবার আগে প্রফুল্লচন্দ্রের এ সম্বন্ধে কোনও রকম অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি মনেপ্রাণে বিজ্ঞানী ও শিক্ষক ছিলেন। কিন্তু মৌলিক রসায়নের জ্ঞান ও ব্যক্তিগত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে গবেষণাসুলভ মন নিয়ে নিজে হাতে-কলমে সবকিছু করে ধাপে ধাপে শিল্প স্থাপনের পথে এগোতে গিয়ে কি ধরনের বাধা আসে এবং সেগুলিকে কীভাবে অতিক্রম করতে হয় ও সঠিক পথ খুঁজে বের করতে হয়—সেইসব অভিজ্ঞতা তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমের দ্বারা অর্জন করেছিলেন। তিনি এই নূতন পথে যাত্রা শুরু করেছিলেন নিজস্ব সঞ্চ য় আট শত টাকা নিয়ে। কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে নয় বৎসর ধরে নিজের ভাড়া বাড়িতে নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে শুরুর শুরু পর্বের ভিত তৈরি করেছিলেন। লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তিত হওয়ার পর তিনি যতদিন ডিরেক্টর ছিলেন—ফি বাবদ সব টাকা কর্মচারীদের হিতার্থে দান করতেন। বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং অন্যান্য কোম্পানিতে গচ্ছিত রাখা প্রায় ছাপান্ন হাজার টাকা দিয়ে গরীব বিধবাদের সাহায্যকল্পে একটি ট্রাস্ট ফাণ্ড গঠন করেছিলেন। তাছাড়া তিনি প্রতিদিন কলেজের কাজ শেষ করে কারখানায় এসে উৎপাদনের কাজ থেকে অফিস ফাইল—সব কিছুই নিজে তদারকি করতেন—কেবলমাত্র কাজকে ভালবেসে, এর জন্য কোনও রকম পারিশ্রমিক নেননি। নিজে মৌলিক রসায়নের বিশ্বমানের গবেষক হয়ে কোম্পানির উৎপাদনকে সময়োপযোগী নূতন পথে প্রসারিত করতে গবেষণা বিভাগ শুরু করেছিলেন। শেষ অবধি তিনি গবেষণা ও উদ্ভাবন বিভাগকে আরও শক্তিশালী করবার অভিপ্রায়ে

অংশীদারদের প্রদত্ত ডিভিডেণ্ড কমাতে চেয়েছিলেন ও পেশাদার বিজ্ঞানীকে বোর্ডে ডিরেক্টর হিসাবে আনতে চেয়েছিলেন। এইসব অভিমতকে কেন্দ্র করে বোর্ডের অন্যান্য সদস্যদের সাথে তাঁর মতানৈক্য শুরু হয়—যার ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত ১৯৪০ সালের ১লা জুন (মৃত্যুর চার বছর পনের দিন আগে) পদত্যাগ করেন এবং পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষরের নিচে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিজের সম্বন্ধে "An evicted and homeless stranger in the land (BCPW) he once called his own"—কথাগুলি লিখেছিলেন। দেশের কথা তথা দেশের কর্মবিমুখ যুবকসম্প্রদায়ের কথা ভেবে তিনি শিল্প প্রতিষ্ঠা করবার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর মানসকন্যা 'বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস'-এর জন্ম দেওয়ার মাধ্যমে তিনি সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তৎপরবর্তী কালে ভারতে অন্যান্য যেসব শিল্প গড়ে উঠেছিল, সেগুলির সর্বৈব উন্নতির ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র উৎসাহ দিতেন। এরূপ একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান 'বঙ্গশ্রী কট্‌ন মিল'-এর সঙ্গে তিনি শুরু থেকেই প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। হাওড়ায় আলামোহন দাশ ব্যক্তিগত কোনও শিক্ষা না থাকা সত্ত্বেও নিজ প্রতিভাবলে বিভিন্ন ধরনের শিল্প গড়েছিলেন। তা দেখে প্রফুল্লচন্দ্র খুব খুশী হয়েছিলেন। তিনি অতীব দক্ষতার সঙ্গে যে বহুপ্রসারিত কর্মজীবন যাপন করেছিলেন, তাঁর শীর্ণ দেহ কখনও তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। তিনি বলতেন, "কাজের মধ্যে আনন্দ থাকলে তাতে স্বাস্থ্যের কোনও ক্ষতি হয় না।" স্বদেশের প্রতি প্রগাঢ় ভালবাসাও ছিল তাঁর অফুরন্ত শক্তির আর একটি উৎস। তাঁর সার্ধশততম জন্মবার্ষিকীতে সকল মানুষ, বিশেষ করে যুবসম্প্রদায় তাঁর জীবনদর্শনের বহুমুখী দিকগুলির কথা মনে রেখে যদি সমাজের সর্বস্তরে বিশ্লেষণমুখী ও যুক্তিবাদী মন নিয়ে নানা ধরনের সমস্যা সমাধানে আগ্রহী ও ব্রতী হতে পারে, তাহলেই পর্বতপ্রমাণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা সার্থক হবে।

আচার্য ও গুরুদেব

দুই মহারথীর পত্র

দুই মহারথী—বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র। এক সময় প্রৌঢ় রাজশেখর বসুকে নিয়ে উভয়ের মধ্যে 'tug of war'—টানাটানি হেঁচড়া হেঁচড়ি চলে। প্রথম টানটি আচার্যদেবের।

কবির প্রতি বিজ্ঞানী

''....সম্প্রতি দেখিতেছি আপনি সত্য সত্যই আমার ক্ষতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, 'গড্ড লিকা'র প্রথম সংস্করণ বিক্রয় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু যখন দেখি সাহিত্য সম্রাট স্বয়ং তাহার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন অচিরে পর পর বারো হাজার কপি যে বিক্রয় হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। সেদিন গ্রন্থকার পরশুরামকে বলিলাম, এ প্রকার সৌভাগ্য কদাচিৎ কোনো লেখকের ঘটিয়া থাকে। এখন তাহার মাথা না বিগড়াইয়া যায়। তিনি আমারই হাতের তৈয়ারী একজন রাসায়নিক এবং আমার নির্দিষ্ট কোন বিশেষ কার্যে অনেকদিন যাবৎ ব্যাপৃত। কিন্তু এখন তিনি বুঝিলেন যে, তিনি সাহিত্যক্ষেত্রেও একজন 'কেষ্টবিষ্টু'। সুতরাং আমাকে অসহায় রাখিয়া ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইতে পারেন।

আসল কথা এই যে, আপনাকে কি অনুরোধ করিব যে, আর একটি তীব্র সমালোচনা করুন যে, পরশুরামের হাত হইতে কুঠার খসিয়া পড়ে? এক সময় পড়িয়াছিলাম যে, অনেক তত্ত্ব ও শক্তি গুহায় নিহিত থাকে;কিন্তু ভগবানের লীলা কে বুঝিবে, কাহাকে কখন গুপ্ত অবস্থা হইতে সুপ্রকাশ করিয়া তুলেন।

ভবদীয়

শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র রায়

বিজ্ঞানীর প্রতি কবি

''সুহৃদ্বর, বসে বসে Scientific American পড়ছিলুম, এমন সময় চিঠির খামের কোণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-সরস্বতীর পদাঙ্ক দেখতে পেয়ে সন্দেহ হল আমার হৃদপদ্ম থেকে কাব্য-সরস্বতীকে বিদায় দিয়ে তিনি স্বয়ং আসন নেবেন এমন একটা চক্রান্ত চলছে। খুলে দেখি—যাকে ইংরেজীতে বলে টেবিল ফেরানো—আমারই পরে অভিযোগ যে আমি রসায়নের কোঠা থেকে ভুলিয়ে ভদ্রসন্তানকে রসের রাস্তায় দাঁড় করাবার দুষ্কর্মে নিযুক্ত। কিন্তু আমার এই অজ্ঞানকৃত পাপের বিরুদ্ধে নালিশ আপনার মুখে শোভা পায়না, একদিন চিত্রগুপ্তের দরবারে বিচার হবে। হিসাব করে দেখবেন কত ছেলে যারা আজ পেট মোটা মাসিক পত্রে ছোট গল্প আর মিলহারা ছন্দের কবিতার সাহিত্য—লোকে একেবারে কিষ্কিন্ধ্যাকান্ড বাঁধিয়ে দিতে পারতো, এমন কি লেখা দায়গ্রস্ত, সম্পাদকমন্ডলীর আশীর্বাদে যারা দীপ্তশিখা সমালোচনায় লঙ্কাকান্ড পর্যন্ত বড় বড় লাফে ঘটিয়ে তুলত, তাদের আপনি কাউকে বি-এস-সি, কাউকে ডি-এস-সি লোকে পার করে দিয়ে ল্যাবরেটরির নির্জন নিঃশব্দ সাধনায় সন্ন্যাসী করে তুললেন। সাহিত্যের তরফ থেকে আমি যদি তার প্রতিশোধ নিতে চেষ্টা করে থাকি কতটুকুই বা কৃতকার্য হয়েছি। আপনার রাসায়নিক বন্ধুটিকে বলবেন, মাসিক পত্রবলে যে সব জীবাত্মা হয়ত বা সাহিত্যবীর হতে পারত ভূষন্ডীর মাঠে তাদের অঘটিত সম্ভাবনার প্রেতগুলির সঙ্গে আপনার মোকাবিলার পাল্টা যেন তিনি রচনা করেন।

আমার কথা যদি বলেন—আপনার চিঠি পড়ে আমি অনুতপ্ত হইনি, বরঞ্চ মনের মধ্যে গুমর হয়েছে। এমন কি ভাবছি স্বামী শ্রদ্ধানন্দের মতো শুদ্ধি কাজে লাগব;যে সব জন্ম-সাহিত্যিক গোলমালে ল্যাবরেটরির মধ্যে ঢুকে পড়ে জাত খুইয়ে বৈজ্ঞানিকের হাটে হারিয়ে গিয়েছেন তাঁদের জোর করে জাতে তুলব। আমার একেকবার সন্দেহ হয় আপনিও বা সেই দলের একজন হবেন। কিন্তু আপনার আর উদ্ধার নেই।....

আপনার

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর''

[সৌজন্যে ঃ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের জীবনবেদ—নন্দলাল মাইতি]

Swastika RNI No. 5257/57
2 August - 2010, Prafulla Ch.Roy Spl.
Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
LICENSED TO POST WITHOUT PREPAYMENT
License No. MM&P.O./SSRM-Kol. RMS/RNP-048/LPWP-028/2010-12

सूर्या लाया है GE टैक्नोलोजी द्वारा
विश्व का सबसे बढ़िया CFL लैम्प

World's best CFL made in India
only by SURYA

PRAKASH
SURYA
STEEL TUBES & PIPES

FARM OR HOME
PRAKASH SURYA PIPES LASTS
FOR YEARS & YEARS

SURYA ROSHNI LIMITED

দাম ঃ ৪.০০ টাকা